

বুদ্ধ দেব গুহ

বিন্দাআস



বিন্দাআস

বুদ্ধদেব গুহ

ক

প্রথম প্রকাশ

জ্যৈষ্ঠ ১৯৬৫

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

জামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করণা প্রিন্টার্স

১৩৮, বিধান সরণী

কলকাতা-৪

বিন্দাআস

কানহারি হিল রোডের পাণ্ডেবাবুর বাড়ি 'দ্যা জ্যাকারান্ডা' থেকে যখন বেরোল সুঘরাই সাইকেলটা হাতে করে ঠেলতে ঠেলতে, তখন রাত প্রায় দুটো।

হাজারিবাগ শহরের এ দিকটা বিশেষ নির্জন। কানহারি পাহাড়ে সবারকম জানোয়ারই আছে। লোকে যদিও বলে, বড় বাঘ নেই। কিন্তু চিতা বহত আছে। একবার এক খতরনাক চিতার সামনে পড়েছিল সন্ধেরাতে। ভাগ্যিস তার নাক খেয়ে নেয়নি। চিতারা নাকি বহতই খতরনাক হয়। কে জানে। হয়তো নাক খেতে ভালবাসে বলেই ওরা খতরনাক। ওর বন্ধু গিরধারী বলে।

ঠাণ্ডাটাও পড়েছে তেমনই এ বছর জঙ্গর। যাদের বউ নেই বা মোটা লেপ, তাদেরই মুশকিল। এতক্ষণ গান চলছিল বলে রাম-এর পাঁইটটা বের করতে পারেনি খন্দরের পাঞ্জাবির পকেট থেকে। পাণ্ডেবাবু মানী লোক। পয়সাওয়ালা, তার উপর ব্যোজোষ্ঠ। তবে এতক্ষণ মস্ত ড্রয়িং রুমে ঘরের মধ্যে বহত দামি দামি গরম জামা আর জামদানি শাল গায়ে চড়ানো স্ত্রী-পুরুষের গায়ের গরম, টাকার গরম ছিল, ঠাণ্ডা তেমন মালুমও হয়নি। দুলারি বাইয়ের দরবারি কানাড়া শুনতে শুনতে এতক্ষণ শরীরের আর কোনও বোধই ছিল না, কোনওরকম দুঃখ-কষ্ট বোধই। শবণসুখই এতক্ষণ একমাত্র ইন্দ্রিয় হয়ে অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কালটা শীত না গ্রীষ্ম না বর্ষা, সময়টা মধ্য-দুপুর না মধ্য-রাত্রি সে-সবের কোনও বোধই ছিল না সুঘরাইয়ের এতক্ষণ। গান শুনে সে একেবারে মস্ত হয়ে গেছে। মেয়েরা গর্ভবতী হলে যেমন মস্ত মনে করে নিজেদের। সার্থক, সেও দুলারি বাইয়ের গান শুনে তেমনই সার্থক মনে করছে নিজেকে। এ-জীবনে আর কোনও কিছু না পেলেও চলবে। এই মুহূর্তটির জন্যেই যেন সে এতদিন বেঁচে ছিল। এ যাবৎ গান বহতই শুনেছে। গান, মানুষকে অনেক কিছু দেয় বলেই জানত এতদিন কিন্তু গান যে এমন করে সব নেয়ও সেটা সুঘরাই জানত না। তাকে নান্দা ফকির করে দিয়েছে একেবারে। দিওয়ানা করে দিয়েছে। দুলারি বাই তার গানকে বুঝি আজ সদকা করে দিয়ে দিয়েছে শ্রোতাদের। বিশেষ করে সুঘরাইকে। সেই দান ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সেই গায়িকার নিজেরও আর নেই।

গান তো শিশুকাল থেকে বেনারসের ডাল-কা-মন্ডি, মির্জাপুরের বাইজি-মহল্লা, লখনউয়ের তওয়াফদের মুখে কতই শুনেছে, গয়া আর পটনার বিভিন্ন ম্যাহফিলে বাঘ-সিংহ পুরুষ গায়কদের মুখেও শুনেছে। মির্জাপুরে যখন ছিল মামাবাড়িতে স্কুলে পড়ার সময়ে, তখন ওর মামাতো দাদার সঙ্গে লুকিয়ে বাইজি মহল্লাতে যেত। শুধু

গান শুনতেই যেত। সেই থেকেই গানের সঙ্গে ওর জীবন জড়িয়ে গেছে।

কাজের মানুষ যাকে বলে, তা আর হওয়া হল না এ জীবনে। ওই গানেরই জন্যে কাজের মানুষ হওয়া হল না, আবার ওই গানেরই জন্যে মানুষ হল।

‘মানুষ’ সংজ্ঞাটির মানে যে সকলের কাছে এক নয়।

উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, উস্তাদ আমির খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর মুখেও ভোপালে ও ইন্দোরে একাধিকবার শুনেছে গান কিন্তু ঠিক এমনটি আর কার মুখেই শোনেনি। সত্যি কথা বলতে কি ওর ধারণা হয়ে গেছিল যে, দরবারি বুঝি পুরুষ গায়কেরাই গান, ও রাগ শুধু তাদের গলাতেই মানায়। আজকে সে ধারণা তার ভেঙে গেছে।

শুধু মস্তাই হয়নি, এই গায়িকার প্রেমাই পড়ে গেছে সুঘরাই। সাচমুচ্। ইংরেজিতে ! যাকে বলে “হেড ওভার হিলস।” মনে মনে ঠিক করেছে যে, বাকি জীবন সে এই দুবলি-পাতলি মিষ্টি নারীর ফাই-ফরমাশ খাটবে—সে নারী সুঘরাইকে চাক আর না-ই চাক, ওই নারীর খিদমদগারি করেই কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন। বান্দা হয়ে থাকবে। শুধু একটু কাছাকাছি থাকতে চায়, গান শুনতে চায় তার, আর তার ওই সুন্দর সুর্মা-চর্চিত বিষাদময় চোখ দুটির একটু প্রশয় পেতে চায়।

যাকে এত গুণ দিলেন বিধাতা তাকে কোন আক্কেলে এমন স্নিগ্ধ রূপও দিলেন তা সেই বেআক্কেলেই জানেন। এর আগে অনেকই সুন্দরী গানেওয়ার্লি দেখেছে সুঘরাই কিন্তু তাদের সেই সৌন্দর্য বড় উগ্র। ছালাধরা তাদের রূপ। এমন স্নিগ্ধ শ্যামা রূপ এর আগে সম্ভবত আর কোনও গায়িকার দেখিনি। তা ছাড়া।

না থাক।

তা ছাড়া, এই মুখটিকে বড় চেনা চেনা মনে হয়েছে সুঘরাইয়ের। কোথায় যেন দেখেছে। স্বপ্নে দেখেছে কি?

উষ্ণ আরামে গানের আভরগন্ধি বাতাবরণের মধ্যে বাবু হয়ে বসেছিল এতক্ষণ সুঘরাই। ‘দ্যা জ্যাকারান্ডা’ বাংলার বাইরে আসতেই কর্কশ বেসুরো পৃথিবীর খপ্পরে এসে পড়ল। শীতটা তার কান পাকড়ে নিঃশব্দে থাপ্পড়ের পর থাপ্পড় মারতে লাগল। সাইকেলটাও একেবারে বরফ হয়ে রয়েছে। শিশিরে ভিজেও গেছে চুপচুপে হয়ে। সেটাকে দঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে একটা জ্যাকারান্ডা গাছে তাড়াতাড়ি হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে ওল্ড মংক রাম-এর পাইটটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে রের করে ঢকঢক করে তিন-চার ঢোক মেরে দিল সুঘরাই। তারপর সাইকেলের হ্যান্ডেল দুটোর কান পাকড়ে, নিজের কান দুটো মাফলারে ঢেকে নিয়ে যখন প্যাডল-এ পা রাখল ঠিক তখনই ঠিক মির্জাপুরী মামাতো দাদা পরজের একটি প্রিয় শের মনে পড়ে গেল সুঘরাইয়ের—‘দিল টুটনেসে খোড়িসি তকলিফ তো হুই লেকিন তামাম উমর কা আরাম মিল গয়া।’

শেরটি কার লেখা এতদিন পরে আর মনে নেই। তারপরই উঠে পড়ল সে সাইকেলে। উঠতেই, পেছনটা যেন জমে গেল। সাড় চলে গেল। প্যাডল-এ চাপ দিল পা দিয়ে। যাবে মগমা। এই শীতের মাঝরাতেও ডি. ভি. সি-র মোড়ে চমকের

বিন্দাস

বন্ধ হয়ে-যাওয়া হোটেলের সামনের আঙুন ঘিরে শুয়ে-থাকা কুত্তার দল তার সাইকেলের পেছন পেছন কেঁউ কেঁউ করতে করতে আসবে। তাড়া করে যাবে ওকে প্রায় কাছারির মোড় অবধি। এম্ম আছে বটে ওই শালা কুত্তাদের।

গত বছরে এক হারামি কামড়েও দিয়েছিল ওর বাঁ পায়ে। প্রায়ই দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ওই সময়ে ও ভাবে যে, একদিন বিষ-মাখানো লাড্ডু খাইয়ে ওই কুত্তার গুটিই নাশই করে দেবে সুঘরাই। কিন্তু রাত পোহালেই আর মনে থাকে না। নিজেকে বলে, আহা। কেপ্টর জীব। প্রাণ নিয়ে আর কী হবে! সকলেই বাঁচুক। সুঘরাইও বাঁচুক, কুত্তারাও বাঁচুক।

কিছুটা যেতেই পেছন থেকে একটা গাড়ির জোরালো হেডলাইটের আলো এসে পড়ল তার গায়ে। গুরুপক্ষের রাত। অষ্টমী নবমী হবে। তা ছাড়া গাড়িটা তখনও বেশ দূরেও ছিল কিন্তু তার হেডলাইটটা বড়লোকের মোসাহেবের মতো গাড়ির আগে আগে প্যায়েরভি করতে করতে নিঃশব্দে এসে হঠাৎই সুঘরাই-এর দু পায়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তার আর তার সাইকেলটার কিছুতকিমাকার ছায়া নিয়ে ভূতের নৃত্য করতে লাগল বৃত্তাকারে, ধুলো-মাখা, হিমে-ভেজা, পথের ধুলোর উপরে, তার সামনে সামনে। রাস্তা মসৃণ না হলে এবং গুরুপক্ষের রাত না হলে এই ছায়াবাজির কারণে সাইকেলসুদ্ধ ও পড়েও যেতে পারত পথের উপরে। এ পাথে এত রাতে তো কোনও গাড়িরই যাবার কথা নয়। তবে কি গানের ম্যাহফিলেরই কেউ? অধিকাংশ শ্রোতারাই তো কাছাকাছি এলাকারই মানুষ এবং সাইকেলেরই আরোহী। অনেকের অবশ্য প্রাইভেট সাইকেল রিকশা আছে। কেউ এসেছে স্কুটার বা বাইকে। গাড়িওলাও ছিলেন জনা চার-পাঁচ। তাঁরা কেউই এখনও বাইরে আসেননি। জানে না, হয়তো বিরিয়ানি-টিরিয়ানির বন্দোবস্ত আছে পাণ্ডে সাহেবের বাড়ির বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। বিশিষ্ট মানে, বড়লোক। তবে সুঘরাইকে খেয়ে যেতে বলেননি পাণ্ডেবাবু। ও যখন বাড়িমুখো তখনও গাড়িওলা শ্রোতারা হয়তো ভিতরেই ছিলেন। গাড়ি চালাতে সুঘরাইও জানে। বাবাতো গাড়িতেই চড়তেন। এখনও গ্যাবাজে একটি অস্টিন টেন আছে। কিন্তু সুঘরাই সাইকেলই চড়ে আজকাল।

রোড কনস্ট্রাকশনের কাজ করে গত পনেরো বছরে কোটিপতি হয়ে গেছে পাণ্ডেজি। আগে মালব্য চওক এ একটা সিঙাড়া-জিলিপির দোকান ছিল। তবে ভাল চলত। দিন রাত সিঙাড়া-জিলিপি ভাজা হত। তারপর পি ডাব্লু ডির এঞ্জিনিয়ার, চিফ এঞ্জিনিয়ার আর মিনিস্টারকে ধরে বরাত খুলে গেল। আজকাল তো/‘দিবে আর নিবে মিলাবে মিলাবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।’ রভিন্দর নাথই তো বলে গেছিলেন। সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হল আজকে। এখন শত্রু পাণ্ডের দুটো জিপ, একটা কালিস, হারহাতের কাছে বাগানবাড়ি, বানাদাগে খেতিজমিন। তা’ক দেখে কে!

হারহাতে তার রক্ষিতা বউ থাকে। ধরবাবুর এম এ পাশ বড়া লেড়কি। ধরবাবুকে মাসে দশ করে দেয়। শালা কামিনা আছে। মেয়ের শরীর ভাজানো রোজগারে ফুটানি মারে। ছাঃ।

পইসাই যখন হল তখন একটু পাওয়ারও তো চাই। এবারে মিউনিসিপালিটির ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে পাণ্ডেবাবু। ক্ষমতাও যখন হচ্ছে তখন একটু আট-কালচার ভি লাগবে তো। কী? লাগবে না?

বিলকুল। কমসে কম এক তবায়ফকি গানা তো হোনাই চাহিয়ে। উসহিকি ম্যাহ্ফিল থী আজ রাতমে। আর যাদের ডেকেছিল সব গিন্ধড়, বেসুরো, বেকামকা আদমি। ওই সব মানুষের সঙ্গে এক ম্যাহ্ফিলে বসে গান শুনতে গা ঘিনঘিন করে সুঘরাইয়ের। কিন্তু ওই যে! পয়সা। ওদের জেব-এ যে বহতই পয়সা আছে। একজন কবিকে ভি ডেকেছিল। যাকে দেখে মনে হয় কসাই। গানের 'গ'ও বোঝে না। বেজায়গায় সম দেখাচ্ছিল, বেতালে চাঁটি মারছিল ফরাসে।

এবারে গাড়ির শব্দটাও শোনা যেতে লাগল পেছনের শিশির ভেজা কাঁচা পথটাতে। তারপর শব্দটা ক্রমশই জোর হতে লাগল। লাহিড়ি সাহেবের বাড়ির কাছে ও পৌছতেই গাড়িটা তাকে পাশ কাটিয়ে আলোর ফোয়ারা ছুটিয়ে সামনের ফিকে অন্ধকারকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকারতর করে দিয়ে চলে গেল। যে বড়লোকেরা আগে সাইকেল চালাত তারাই সাইকেলে-বসা মানুষদের আলো দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে পথে ফেলে আনন্দ পায়। অজীব সব ইনসান শালারা। গাড়িটার মিউজিক সিস্টেমে গাঁক গাঁক করে দুলারি বাইয়ের গাওয়া দরবারি কানাড়াই বাজছিল। নিশ্চয়ই ওই ম্যাহ্ফিলে বসেই টেপ করেছে। কাল সকালে নাস্তা করতে করতে শুনবে। গিন্ধর হয়তো ওইটুকুও জানে না দরবারি কখনকার রাগ।

অন্ধকারে গাড়িটা চেনা গেল না। তবে পেছনে নানা ঝিং-চ্যাক লাল নীল সবুজ হলুদ আলো দেখে মনে হল, গয়া রোডের অভিষেক সিংয়েরই হবে।

॥ ২ ॥

দারুণ কেয়ারি করা বাংলা। ধানবাদের কয়লা কিং অভিষেক সিংয়ের। আগেকার দিনে কয়লা-কিং বলতে বুঝাত খনির মালিকদের। আজকাল সব ঘুষের কারবারি খুনখারাবি-করা মাফিয়ারাই কিং। নানা ফুলের বাহার। মালী-বেয়ারা-বাবুর্চির ডিপি। বছরে তিনবার আসে ধানবাদ থেকে ইয়ার-দোস্ত নিয়ে অভিষেক সিং। একবার গরমে, একবার শীতে, আরেকবার বর্ষাতে। খানা-পিনা-ফালানা-চামকানা চলে। শিকার করা কবেই বেআইনি হয়ে গেছে কিন্তু তবু চুরি করে সিমারিয়ার রাস্তাতে আর রাজডেরোয়াতে শিকার করে অভিষেক সিং আর তার দলবল। শিকার বলতে, মুরগি-ময়ূর-তিতির-বটের-খরগোশ এই সব। যা পায়, তাই মারে। ট্রিগার টেনে হাতের সুখ করে। বড়ই ট্রিগার হ্যাপি তারা। খুব বড় শিকার হলে কখনও কোটাটা একটা। ওইটুকুই তার শিভালরি। পটনাতে চাণক্যপুত্রীর শ্বশুরবাড়িতে গেলে, রোমহর্ষক শিকারের গল্প করে। তবে খতরনাক জানোয়ারের ছায়া মাড়ায় না সে আর তার দলবল।

অবশ্য চিতা বা বড় বাঘ মেরে হজম করাও মুশকিল। শীতকাল হলে তিলাইয়ার বাঁধের জলে বিদেশ থেকে উড়ে-আসা বড় বড় নাকটা হাঁস মারে। সবই বেআইনি।

বিন্দাআস

কিন্তু এখন এ দেশে যার পয়সা আছে আইন তো তার জেবেই বন্দি। বিহারের জমানাতে যা ছিল ঝাড়খণ্ডেও তাই। শুনতে পায়, পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাতেও নাকি তাই-ই। যথার্থই স্বাধীন হয়ে গেছে পুরো দেশই। তামাম দুনিয়া সেলাম ঠোকে সেই লোককেই যার পকেট-ভর্তি টাকা। অথবা যার হাতে ক্ষমতা। তার যা খুশি, তাই করে সে।

কয়েকবছর আগে সিন্দুর বস্তি থেকে ওই অভিষেক সিং পটকানের কাকা ভিখু কাহারের সুন্দরী মেয়েটাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে তিলাইয়ার বাংলাতে ইয়ার-দোস্তুদের সঙ্গে নিয়ে রেপ করে তারপর রাজডেরোয়া ন্যাশানাল পার্কের পাঁচ নম্বর ওয়াচ-টাওয়ার থেকে নীচের জংলাকীর্ণ খাদে মেয়েটার নাসা শরীরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। মেয়েটার নাম ছিল বুধিয়া। বুধবার জন্মেছিল বলে। শকুন লাশের উপরে পড়ে যাওয়াতে তার পরদিন দুপুরে এক ফরেস্ট গার্ডের নজরে আসে। লাশের হৃদিস হয়। ততক্ষণে সুন্দর শরীরটার কিছু বাকি ছিল না। শকুনোরা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে নিয়েছিল শবের সবই। ওপড়ানো-চোখ মাথাটা ছাড়া। আর কঙ্কালটা।

স্থানীয় মানুষেরা সকলেই অভিষেক সিংকেই সন্দেহ করেছিল কিন্তু কেউই কিছু বলল না বা করল না। সাক্ষী-প্রমাণেরও অভাব ছিল। বড়লোক বা গুণ্ডা-বদমাশদের রোষে পড়লে পুলিশ বা প্রশাসন তো বাঁচাতে আসবে না। ভারতের কোনও রাজ্যেই আসে না আজকাল। যা অবস্থা এখন তাতে মনে হয় ট্যাক্সো ফ্যাক্সো না দিয়ে নিজের নিজের মান-জান নিজেদেরই সামলাতে হবে। খামোখা নিজের বিপদ কে ডেকে আনতে চায়?

পটকানের কাকিমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল কিছুদিন আর তার বাবা ভিখুর চোয়াল দুটো চিরদিনের মতো শক্ত হয়ে গেছিল। হাসতে ভুলে গেছিল ভিখু কাহার। তবু একজনও প্রতিবাদ করেনি। এ এক অজীব দেশ। অন্যকে বলে কী হবে। সুঘরাইও করেনি। সেও অজীব। নিজের গায়ে মাঝে মাঝেই থুথু দিতে ইচ্ছে করে।

হাজারিবাগ এবং ঝুমরি তিলাইয়ার থানা, বাংলার চৌকিদার, ফরেস্ট ডিপার্টের গার্ড, রেঞ্জার সকলকেই টাকার খলি ঘুষ দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিল অভিষেক সিং।

নিমপাতা বা ট্যাপারি কি পানিফল সকলে নাও খেতে পারে কিন্তু ঘুষ আজকাল সকলেই খায়। ইংরেজিতে যাকে “STAPLE FOOD” বলে, মূল খাদ্য, ঘুষ এখন তাই হয়ে গেছে স্বাধীন ভারতে। বহুত পড়ে-লিখে সব মানুষই, প্রফেসর, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, আর্মি-অফিসর, আমলা, সকলেই এখন চ্যাম্পিয়ন ঘুষখোর। থানাদার বা ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স ওয়ালাদেরও লজ্জা দিচ্ছে তারা। প্রয়োজন থাক আর নাই থাক ঘুষ খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে সকলেরই। এ খেয়ে জোয়ানের আরক বা পুদিনহারাও খেতে হয় না। হজমের কোনওই গোলমাল হয় না।

এখন সকলেরই সব চাই। ছেলেবেলায় সুঘরাই দেখেছে যে, যোগ্যতার সঙ্গে প্রাপ্তির একটা সম্পর্ক ছিলই। এখন সে সব চুলোয় গেছে। ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার ছেলে পরীক্ষা পাশ করে গিয়ে হুটছে সরকারি নানা ডিপার্টে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ, ইনকাম ট্যাক্স, তারজন্য কর্মপটটিভ পরীক্ষাতে বসে তা পাশ করে ঢুকে পড়েছে

বিন্দাআস

ঘুষ খাওয়ার জন্য। যা এই দেশের অবস্থা এখন এই সব কর্মপিটিটিভ পরীক্ষা পাশ করার মধ্যেও ঘুষ-ঘাষ ঢুকে পড়েছে কি না কে জানে। ঘুষ যে সর্বের মধ্যেই ঢুকে গেছে। কোন ওঝা ওই ভূত ছাড়াবে কোন সর্বের দিয়ে? ঘরে ঘরে ঘুষের মহোৎসব লেগে গেছে। বিবেক-টিবেককে ছারপোকার মতো টিপে মেরে দিয়েছে সকলে। বিবেক আর কামড়ায় না কারওকেই। মেয়েটার অমন মর্মান্তিক মৃত্যুর পরে সকলেই বলেছিল, মানে আম-জনতা, হা রাম! যো হোনা থা উতো হোয়ি গয়া, অব কর্না কা?

বলে, দু তালুতে খইনি মেরে খেয়ে নিজের নিজের বিবেককে খোঁকা দিয়েছিল। শুধু পটকান পনেরো দিন মুখে খাবার তুলতে পারেনি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। অসহায়েরা যেমন চিবিদনি সকলের অন্যায় সহ্য করে কেঁদেছে তেমনই করে। এতে আর নতুনত্ব কী? তা দেখে, নিজেকে অভিশাপ দিয়েছিল সুঘরাই। নিজের উপরে ঘেন্না হয়েছিল।

অন্যায় যারা করে, আর অন্যায় যারা সহ্য করে তারা যে সমান অপরাধী এ কথা কেউই বলে না আর আজকাল। আর তাই অন্যায়কারীদের সাহস ধীরে ধীরে সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষমতাবানের প্যায়েরভি, মোসাহেবি সকলেই করে। অনপড় থেকে পড়ে-লিখে। সেটাই সুবিধাজনক বলে।

সময় সবই ভুলিয়ে দেয়। বুধিয়ার এই নৃশংস মৃত্যুর শোককেও দিয়েছিল। নিজের নিজের স্বার্থ ও সুবিধা বিবেচনা করে সকলেই ভুলে গেছিল এত বড় অন্যায়টাকে। কিন্তু সুঘরাই ভোলেনি। প্রতি নিঃশ্বাসে, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সেই কাঁটা তাকে বাজে। কিছু একটা করতে তাকে হবেই। আজ আর কাল। নইলে আয়নার সামনে সে আর দাঁড়াতে পারবে না। সুঘরাই দলের জানোয়ার নয়, সে একরা। সকলেই যা করে সুঘরাই তা কখনওই করেনি। সে কোনও যুথপতি বা গোদার অঙ্গুলিহেলনে চলেনি জীবনে। একদিন মওকা পেলে বুধিয়ার মৃত্যুর বদলা সুঘরাই নেবেই। খুনকা বদলা খুন।

খয়ের, মওকা খোঁজে সে, যখনই অভিষেক সিং পটনা থেকে আসে। কিন্তু হারামি যে এক! আসে না কখনওই। অনেক অন্যায় অনেকের প্রতি তারা করে বলেই নানা ভয়, নানা হীনম্মন্যতা, নানা পাপবোধ তাদের ছেয়ে থাকে সবসময়ে। তাই কোনও কামিনাই কখনওই একা থাকে না, একা চলাফেরা করে না। কী হাজারিবাগে, কী গয়ায়, কী পটনা-কলকাতায়, মুম্বইতে। তারা সব সময়েই দলে থাকে। দলবদ্ধ জীব বলেই একা থাকার সাহস ও ক্ষমতাই ওদের ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। মন্দিরে কি গোসলখানাতেও হারামিরা একা যেতে ভয় পায়। হারামিদের লক্ষণই এই।

যার যত টাকা তার প্রাণের ভয় তত বেশি। টাকা যত বাড়ে, ভয়ও তত বাড়ে। বুন্ড-এ থাকা জানোয়ারের মতো এদের স্বভাব, রাহান্-সাহান্ সবই। এদের সব সাহসও দলেরই সাহস। 'একরা' জানোয়ারের মতো এরা স্বনির্ভর নয়।

খয়ের, ভাবে সুঘরাই, একদিন না একদিন সুযোগ আসবে নিশ্চয়ই। নইলে

পটকানটার কাছে কী করে সে মুখ দেখাবে? পটকান যে তারই আশ্রিত আর বুখিয়া ছিল তার বোন।

দু পা মাটিতে নামিয়ে, সাইকেলটা থামিয়ে, আবার ঢকঢকিয়ে খায় কিছুটা রাম। ডি.ভি.সি-র মোড় সামনেই। কুকুরগুলোর জন্য তৈরি হতে হবে। সে হারামিরাও দলবদ্ধ জীব। কুকুরে আর মানুষে তফাত রইল না কোনও।

এই হাজারিবাগ ছোট্ট জায়গা। এখানের সব বড়লোকদের বাড়িতেই কলকাতার রহিস আদমি পটা ঘোষের যাতায়াত আছে। যেমন আজ পাণ্ডে তাকে ডেকেছিলেন। বেজায়গাতে সম দেখিয়ে আঙুল দিয়ে নিজেকে সমঝদার জাহির করছিল গানের। এদের কেন যে আসতে বলা ম্যাহফিলে।

কলকাতার পটা ঘোষ এলে তার বাড়িতে পার্টি লেকেই থাকে। আর উপোসী হারপোকার মতো স্থানীয় কিছু স্বল্প-রোজগারি আর রিটার্ড মানুষ নির্লজ্জন মতো মদ আর ভালমন্দ খাওয়ার জন্য তার বাড়িতে ভিড় করে মাছি পড়ার মতো। মোসাহেবি করে এমন যে, চোখে দেখা যায় না।

সুঘরাইদের ছেলেবেলাতে কিন্তু এমনটি ছিল না। আজোবাজে লোকের বাড়িতে, তার যতই পরস্যা থাক, ডাকলেই মানুষে যেতেন না। অভিজাতা, শিক্ষা এ সবের দেওয়াল ছিল।

পটা যা বলে, তাতেই আহা! আহা! করে সকলে। সর্বজ্ঞ পটা ঘোষ ক্লাসিক্যাল গান ধোঝে, রভিন্দর সঙ্গীত বোঝে। গাড্ডু খাঁ সাহেব, নামী সেতারি পটা ঘোষের জিগরি দোস্ত। পটার হাতে সব খবরের কাগজ। কলকাতার বিবেকহীন জার্নালিস্টগুলো পরের পরসায় মাছের মতো মদ গেলে আর পটার কথা মতো একে তোলে আর ওকে ফেলে। মানুষটা একটি অজীব চিহ্ন।

পটা আদৌ মানুষ কি না সে সম্বন্ধেই সন্দেহ আছে সুঘরাইয়ের। সে জীবনে ও সংসারে একটিমাত্র সম্পর্কের কথাই জানে। সেই সম্পর্ক মালিক আর চাকরের সম্পর্ক। এ ছাড়া সংসারে যে আরও অনেক সম্পর্ক থাকতে পারে, এবং থাকে, তা তার ধারণার মধ্যেই নেই। শুনেছে যে, পটা ঘোষের পরমাসুন্দরী পুতুল-পুতুল বউ আছে একটি। ইট-চাপা ঘাসের মতো ফরসা। শুনেছে। যেমন বেন্টলি গাড়ি আছে, মার্সিডিজও আছে, আলিপুরে প্রাসাদোপম বাড়ি আছে, বারাসাতে, কালিম্পাও এবং হাজারিবাগেও বাড়ি আছে। বউয়ের সঙ্গে সম্পর্কটাও চাকর-মনিবের কি না, তা জানে না সুঘরাই। বউ নিয়ে একবারও আসেনি হাজারিবাগে পটা ঘোষ।

সুঘরাইও যায়নি কখনও কলকাতায়। সুঘরাইয়ের পৃথিবীটা বড়ই ছোট। যদিও অন্তর্ভুক্তটা ছোট নয়। একদিকে রামগড় হয়ে রাঁচি, অন্যদিকে কুমরি-তিলাইয়া, আর আরেক দিকে সিমারিয়া, বড় জোর চাত্রা বা চান্দোয়া-টোরি। এই নিয়েই সুঘরাইয়ের পৃথিবী।

নানা ছাইভস্ম ভাবতে ভাবতে মগমাতে তার ঠাকুরদার তৈরি পাথরের দোতলা বাড়িতে পৌছে গেল এক সময়ে সুঘরাই। তার খিদমদকার ছেলেমানুষ পটকান একতলার বসার ঘরের কোণে টোপাইতে রাজাই মুড়ে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে ছিল নিভে যাওয়া কাঙ্গরিব পাশে শুয়ে। দরজায় দুবার শিকলি নাড়তেই দরজাটা খুলে

দিল পটকান ঘুম চোখে। যন্ত্রচালিতের মতো। কর্তব্যজ্ঞান টনটনে। পটকানের বাড়ি সিন্দুর গাঁয়ে। ভিখু কাহারেরই বোনের ছেলে ও। দরজাটা খুলে দিয়েই আবার রাজাইয়ের মধ্যে কুকুর-কুণ্ডলী পাকালো সে। পাশের বাড়ির বহত মালদার এম ভি. আই. গাজু তিওয়ারির অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা দরজা খোলার শব্দে ঘাউ ঘাউ করে উঠেই চেনা শব্দ বুঝে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল মালিকের সাপ্লাই-করা সিঙ্গাপুরী কন্সলের উপরে।

সুঘরাই সাইকেলটাকে একতলার ঘরে রেখে, দরজা বন্ধ করে দোতলাতে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে রাজাইটাকে হাত দিয়ে ছুল। বিছানার উপরে রাজাইটা চাপানোই ছিল। রাজাইয়ের উপরটা ডিপফ্রিজে রাখা মালাইয়ের মতো হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা, কিন্তু মসৃণ। চেয়ে দেখল দোতলার বারান্দাটা চাঁদের ফিরে আলোতে ভরে গেছে। তখনি শুতে ইচ্ছে করল না। ঘরের দরজার সামনে আরাম-কেন্দারটা টেনে নিয়ে বসে সুঘরাই মনে করার চেষ্টা করছিল কোথায় দেখেছে ও দুলারি বাইকে আগে। কিছুতেই মনে করতে পারল না।

দুটো পঁচা একটা গামহার গাছকে ঘিরে ঘিরে চক্রাকারে ঝগড়া করছিল। টিভেল দম্পতির মতো। সব দম্পতিই কি একরকম হয়? কে জানে! ঝগড়া হবে এই ভয়েই তো বিয়েই করেনি সুঘরাই। করবেও না। বহত ঝামেলা। বেশ আছে! ডিগ্রি পায়নি কোনও, চায়ওনি, কিন্তু পড়াশুনো কবে, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি। গান শোনে। নিজের পেট চলে যায়। সাইকেলটা আছে, যেখানে যেতে চায় চড়ে পড়ে। আর বেশি কী লাগে বাঁচতে?

বারান্দাতে কতকগুলো চন্দ্রমল্লিকা করেছে পটকান টবে। লতিয়ে উঠেছে কিছু লতা নীচের থাম বেয়ে ছাদে। হাসনুহানা, হেমা। তবে শীতে কোনও গন্ধ নেই। তবু গাছ-পাতা-লতার একটা নিজস্ব গায়ের গন্ধ তো থাকেই। শিশিরে ভিজে সে গন্ধ আরও তীব্র হয়। চাঁদের আলো, চাল-ধোওয়া জলের মতো, কোরা শাড়ির মতো ছাদময় মেলা আছে। পূর্ণিমা হলে এ আলো ধবধবে সাদা হবে। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর দুলারি বাইয়ের মুখটি মনে করতে করতে হঠাৎই সুঘরাইয়ের বরিস পাস্তারনাক-এর ওর খুব প্রিয় কবিতার কটি পঙক্তি মনে পড়ে গেল। ওর এরকম হয়। সুন্দরী নারীর মুখ আর সুন্দর কবিতার পঙক্তি একই সঙ্গে মনে পড়ে যায়।

“The nights now sit down to play chess with me Where ivory moonlight chequers the floor. It smells of Acacia the windows are open. And passion, a grey witness, stands by the door.” রাশ্যান পাস্তারনাক সাহেব রাশিয়ার শীত অবশ্যই হাড়ে হাড়ে জেনেছেন তবে হাজারিবাগের শীত দেখেননি। তাঁর কবিতাটি যদিও শীতে রচিত নয়। হাজারিবাগের শীতে লিখলে অন্যরকম করে লিখতেন। অবশ্যই।

সুঘরাই বারান্দার দরজার মোটা কাঠের হুকোটো দড়াম শব্দ করে বন্ধ করে লেপটা তুলে রাম-এর পাইটটা চকচকিয়ে শেষ করে। দুটি হাত জোড়া করে দুই উরুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু উষ্মতার জন্যে দুলারি বাইয়ের মুখটা

বিন্দাআস

মনে করার চেষ্টা করল একবার। এ মুখ তার খুব চেনা, খুবই চেনা, কোথায় যেন দেখেছে!

পরমুহূর্তেই ঘুমে কাদা হয়ে যেতে যেতে ভাবল, আজ কি স্বপ্নে দেখতে পাবে মুখখানিকে?

॥ ৩ ॥

প্লাসে করে চা বানিয়ে নিয়ে এসে পটকান দরজাতে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙল সুঘরাইয়ের। পটকান প্রথম দিন থেকেই সুঘরাইয়ের নামটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, বলে সুধাবাবু। নামটা অবশ্য একটু বিদঘুটেই। মির্জাপুরের মামা নাম দিয়েছিলেন ওদের দু ভাইবোনের সুহা ও সুঘরাই। দুই রাগের নামে। যারা রাগ-রাগিণীর বিষয়ে আনপড় তাদের পক্ষে এ সব নাম হজম করা মুশকিলও।

জবরদস্ত ঋপদিয়া ছিলেন সুঘরাইয়ের মামা অনন্তপ্রসাদ চৌরাশিয়া। কোথায় না কোথায় তাঁর ডাক পড়ত গান গাইতে। তখনকার দিনে নিজের ছেলের নাম রেখেছিলেন পরজ আর ওদের দু ভাইবোনের নামও রেখেছিলেন মামা রাগের নামে। সুহা আর সুঘরাই। সুহা, সুঘরাইয়ের দিদি খুব ভাল গাইত। আগ্রা ঘরানার উস্তাদ ফৈয়াজ খা সাহাব-এর একজন তৈরি শিষ্য মুস্তাক আলি খা সাহেবের কাছে খেয়াল-ঠুমরি সবই শিখেছিল। ওস্তাদ মুস্তাক আলি খা সাহাব ম্যাহ্‌ফিলে গাইতেন না, মা সরস্বতীর সাধনা করতেন ঘরে বসেই। যাঁরা তাঁকে শুনেছেন তাঁরাই জানেন কোন জাতের গাইয়ে ছিলেন তিনি অথচ নিজের হাভেলি থেকে তাঁকে কেউ গান গাইবার জন্য বের করতে পারেনি। ইলাহাবাদের এক বহুত পরসাওয়ালা রহিস পরিবারে ওই গানের গুণেই সুহা দিদির বিয়ে হয়ে গেছিল। তেমন সুন্দরী ছিল না দিদি।

এখন সুহা ওর শ্বশুরবাড়িতে ম্যাহ্‌ফিল বসলে চিকের আড়ালে বসে তওয়ায়েফ বা উস্তাদ বা পণ্ডিতদের গান শোনে। নিজের তানপুরাতে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। কখনও চৈতি হাওয়াতে কোনও মৌমাছি বা নীল মাছি জানালা গলে তানপুরার তারে এসে অচানক পাখনা নেড়ে গেলে যে মুহূর্তের ঝংকার ওঠে তাতে নিজেই চমকে ওঠে সুহা দিদি। সুহা দিদির কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। যে মানুষের মধ্যে গান আছে বা ছিল তার মধ্যে গান থেকেই যায়, বাইরে তার প্রকাশ হোক আর নাই হোক। দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে হলেও সেই গান প্রশ্বাস নিয়ে ঠিকই বেঁচে থাকে।

এই সব দেখে শুনে সুঘরাই বুঝেছে যে কোনও জিনিসই, সে গানই হোক, কী পড়াশুনো, কী প্রেম, শুরু করাটা খুবই সোজা, শেষ করাটাই আসল। দিদির গান শেষ অবধি হল না। নিজের পাঁচ ছেলেমেয়ে, দুই জা, তাদের দুটি করে, বৃদ্ধা অসুস্থ শাশুড়ি, বদমেজাজি বৃদ্ধ শ্বশুর, আঁচলে বাঁধা আলমারির চাবির গোছ, এতকিছুর মধ্যে গান কবে যে গোপনে বিদায় নিয়ে চলে গেছে তা বুঝতে পর্যন্ত পারেনি সুহা দিদি।

বিন্দাআস

সুঘরাইয়ের মামা অনন্তপ্রসাদ আক্ষেপ করতেন মায়ের কাছে, মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, যে, আমারই দোষে সুহা বেটির গানবাজনা হল না। নাড়া বেঁধে, হাতে সুতো বা সোনার চেন বেঁধে অনেকেই গুরুর কাছ থেকে গানের আস্তাই আদায় করতে পারে সহজেই, কিন্তু গানের আলো আদায় করা অত সহজ নয়। সুহা দিদি উস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সাহাবের কাছ থেকে আলোই আদায় করেছিল। মামাও পয়সাওয়ালা পরিবার দেখে ভেবেছিলেন, গান বাজনার কদর ওরা করবে। কিন্তু বহুত পয়সাওয়ালা বলেই বোধ হয় কদর করল না। তওয়ায়েফ-এর কদর করা আর মা সরস্বতীর কদর করা এক কথা নয়। তা ছাড়া বড় দেরি করে বুঝেছিলেন মামাজি, যে লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতী খুবই কম সহাবস্থান করেন।

সামনের প্রাচীন বটগাছের পাতাতে যে রোদ ঝিলমিল করছে তার উপরে কমপক্ষে শ পাঁচেক হরিয়াল এসে বসে বটের ফল খাচ্ছে। বটগাছে ফল আসে পুজোর সময়ে কিন্তু এ গাছটাতে ফল ধরে সারা শীত। রোদের চুমকানিতে কোনটা পাতা আর কোনটা সদা-চঞ্চল সবুজ হরিয়াল তা বোঝা যাচ্ছে না।

ঝকঝক করছে রোদ। বড়া মসজিদের দিক থেকে একটা টানা গুঞ্জরন আসছে। আজকে ওদের কোনও তেওহার আছে মনে হয়। সকাল থেকেই হইরই শোনা যাচ্ছে। হাজারিবাগ শহর আগে খুবই সুনসান ছিল। বাংলাদেশের যুদ্ধের পরে সেই যে দলে দলে এল ওরা পশ্চিমবঙ্গ হয়ে, সেই থেকে সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লেগেছে। এখন এখানে হিন্দুরাই সংখ্যালঘু।

সুঘরাইয়ের অনেক মুসলমান দোস্ত আছে। বেশ লাগে ওদের। মনমৌজী। খানা-পিনা, গানা-বাজনা সবোতেই উৎসাহ আছে; হিন্দুদের মতো প্যানপ্যানানি নেই। ওর দোস্ত নাসির কথায় কথায় একটা শব্দ ব্যবহার করে—বলতে গেলে ও একাই ওই শব্দটাকে চালু করে দিল হাজারিবাগে। শব্দটা হল বিন্দাআস! ওকে কেউ ঠকিয়ে গেল তো নাসির বলল, বিন্দাআস। নাসির কাউকে ঠকিয়ে এল, তখনও মুচকি হেসে বলল, বিন্দাআস। ওর ছোটামামা ওর মেজদির সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করল, নাসির বলল, বিন্দাআস। বদু মিয়ার নধর পাঁঠাকে দুপুরবেলা চুরি করে এনে জবাই করে কেটেকুটে চাঁব, পায়া, বিরিয়ানি, লাঝা, চোরি করে বেঁধে সন্ধ্যাবেলা দোস্ত-বিরাদরদের ডেকে রাম সহযোগে জোর খানাপিনা করল, তারপর চোখ মেরে বলল, বিন্দাআস।

বিন্দাআস শব্দটার মানে যে ঠিক কী তা সম্ভবত নাসির নিজেও জানে না। সুঘরাইয়ের মনে হয় ইংরেজি 'could not careless'-এর সঙ্গে খুব মিল আছে শব্দটার।

রোদের মধ্যে ছাদে বসে চা-টা খেতে খেতে সুঘরাইয়ের আজ নাসিরের কথা খুব মনে পড়ছিল। নাসিরেরও গান বাজনার খুব শখ। কাল রাতেব দুলারি বাইয়ের গানের রেশ এখনও তার মনকে ভরে আছে আর সেই জন্যেই দুলারি বাইয়ের গানের সঙ্গে নাসিরের কথা মনে পড়ে গেল সাতসকালেই। নাসির ওর জিগরি দোস্ত। নাসিরকে ও মির্জাপুরে মামাবাড়িতেও নিয়ে গেছে ছেলেবেলায়। সুঘরাইয়ের

বিন্দাআস

ছোট মামাতো-বোন চামেলিকে খুবই পছন্দ ছিল নাসিরের। তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে হলে দাঙ্গা লেগে যেতে পারত।

ধুম থেকে উঠেছিল আজ খুব দেরি করে। সকালের ডাক নিয়ে এল পটকান বাজার করে ফেরার সময়ে। চা-টা সুঘরাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়েই চলে গেছিল। জলের ট্যাস্কের নীচে মাছওয়ালারা আসে তিলাইয়া ডামের মাছ নিয়। দেরি করে গেলে ভাল মাছ পাওয়া যায় না। সুঘরাই অত মাছের ভক্ত নয়। আসলে মাছ ভালবাসে পটকানই নিজে। তাই দৌড়ে যায়। সুঘরাই বোঝে, কিছু বলে না। আনন্দ পায় ছেলেটা একটু মাছ খেয়েই। আনন্দ পাক। কতই বা মাইনে পায়! খেতে পায় সেইটুকুই যা। ওদের বস্তির ঘরে তো বছরে কদিন ভাত খেতে পায় তাই অজানা। দু মুঠো ভাতই ওদের কাছে মস্ত বিলাস।

পটকান কথা কম বলে। ছাদে উঠে এসে বলল, নাসিরবাবু এসেছেন।

কেখায়?

চমকে উঠে বলল সুঘরাই। যার কথা ভাবছিল সেই এসে হাজির।

মোটর সাইকেল রেখে আসছেন উপরে।

তারপরই বলল, অভিযেক সিং কোররার মোড়ে একটা বাচ্চাকে গাড়ি চাপা দিয়েছে একটু আগে।

সে কী রে! তারপর?

লোকে গাড়ি ঘিরে ফেলেছিল। পাচশ টাকা দিয়ে চলে গেছে।

ছেলেটা?

হাসপাতালে।

অবস্থা কেমন।

গুনলাম ভাল না। নাও বাঁচতে পারে।

কার ছেলে?

লালু হাজারের। পথের পাশে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল আর জিলিপি খাচ্ছিল। আর তার বাবা চুল কাটছিল লোকের। আজ তো জুম্মাবার। সকাল থেকেই ভিড়।

তারপর?

নাসির উঠে এল ছাদে।

বলল, তারপর আর কী? ওখান থেকে তো সোজা কোতোয়ালিতে চলে গেল সিং বাবু। বড় দারোগা ইমানদার নেক আদমি। কিন্তু মহা খচরা ছোট দারোগাটা। মনে হচ্ছে তাকে ফিট করে দিয়েছে এতক্ষণে। সকলে বলছিল। বড় দারোগা সিমারিয়াতে গেছে ইন্সপেকশনে। পটকান বলল, ইন্সপিকশান।

সুঘরাই ভাবল, ছেলেটা মরে গেলেই বা কী হবে। পটকানের দিদি বুধিয়া মরে গেল তো কী হল? বিন্দাআস।

চা এনে দে দাদাকে।

সুঘরাই বলল।

তারপর পটকানকে বলল, গেলি মাছ কিনতে জলের ট্যাস্কের নীচে তা কোররার মোড়ে তুই কী করতে গেছিলি?

বিন্দাআস

বা-রে। আপনি কাল রাতে বললেন যে, গরম জিলিপি আর সামোসা আনতে।
বলেছিলাম?

হ্যাঁ তো।

ছাদে উঠে এসে নাসির বলল, আরে মাঠরীভি লাও পটকান, দো চার ডরজন,
কম সে কম, নেহি তো পটকা দেগা। খ্রিফ চায়ে নেহি দেনা।

সমঝা না?

পটকান হেসে বলল, জী। আভ্ভি লায়্য বাবু। গরম গরম সামোসা আর জিলাইবি
ভি লায়্যেগা।

লাও। মগর মাঠরীভি লাও।

পটকানের হাতের ঘিয়ে ভাজা মাঠরী খুব প্রিয় নাসিরের।

পটকান চলে গেলে নাসির বলল, দুলারি বাইকি গানা শুননা হ্যায তো সাত
বাজি ঝিলকুল তৈয়ার হোকে রহনা। ম্যায় উঠাকে লে যাউঙ্গ।

কাঁহা হ্যায় ম্যাহ্‌ফিল?

ছদিবাবুকি ঘর।

কালভি তো থে পাণ্ডেবাবুকি ঘর। তু তো আয়া নেহি।

ম্যায় সব দাওয়াত পুরা নেহি করতা হঁ।

তুমহারা থা দাওয়াত?

নেহি তো ক্যা?

কাহে? গ্যয়া কাহে নেহি?

বিন্দাআস।

নাসির বলল।

তারপর নাসির বলল, ইয়ে দুলারি বাই হ্যায় কওন তু জানতে হো?

জানতা তো নেহি মগর সকল অ্যায়সী লাগা কি ক্যা?....

খোয়াব মে দেখা হোগা।

বকওয়াস মতো কর।

নেহি। উও নেহি, মগর, সাচ

দিখা তো তু জরুর।

নাসির বলল।

চমকে উঠে সুঘরাই বলল, কাঁহা?

ওর বৃকের মধ্যেটা ধড়ফড় করতে লাগল। নাসিরের কথা শুনে মনে হল নাসির
যেন চেনে দুলারি বাইকে।

কাঁহা? ম্যায় ক্যাহে বাতাউ। শোচ, শোচ, শোচ, তব হি না জবাব মিলেগী।

বলেই, চোখেমুখে এক দুষ্টুমির হাসি এনে জিয়ার সেই বিখ্যাত শেরটি আউড়ে
দিল ডান হাত নেড়ে।

‘কৌনসা জখম কা খুলা হ্যায় টাকা

আজ ফির দিলমে দর্দ হোতা হ্যায়।’

কোন পুরনো ক্ষতের সেলাই খুলে গেল তা কে জানে! আবারও রক্তক্ষরণ

বিন্দাস

ওরু হয়েছে আমার হৃদয়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুঘরাই বলল, ইয়ার্কি না মেরে বলই না আসল কথাটা?

নাসির বলল, তোর মামাবাড়ি মির্জাপুরের কথা মনে আছে কিছু? সেই যে

পরজদাদা আমাদের নিয়ে বাইজি মহল্লাতে গান শুনতে যেত?

আছে বইকী।

মুন্নি বাইয়ের কথা মনে আছে?

আছে না? আহা! হোরি ধামার কী গাইত। জীবনে কোথাও অমন না শুনেছি, না আর শুনব।

তার ছোট বোনকে মনে আছে? শবনম। যার জন্যে পরজদাদা চকলেট নিয়ে যেত আর যে মহিন্দাতে যেত আমাদের সঙ্গে চড়ুইভাতিতে। বিলাওল ঠাটের একটা বন্দিশ গাইত সে ভারী মিষ্টি করে—যেন মধু ঝরত। মনে নেই? দু বিনুনি করে থাকত মা-মরা মেয়ে। মোটা করে সুর্মা লাগাত আর ফিরদৌস আতর মাখত। মনে নেই? ছোট্ট ছিল তখন।

তুই বলতিস কানে কানে ফিসফিস করে, চোখ দুটো কী সুন্দর রে। বড় হলে আমি ওকে বিয়ে করব।

আমি বলতাম, বড় তুই নিজেই তো আগে হয়ে নে। তা ছাড়া, সে ঘটনা ঘটলে আমি সবচেয়ে আগে দাস্তা লাগাব।

আসল কথাটা বলই না।

অধৈর্য সুঘরাই বলল।

নাসিরউদ্দিন বলল, দুলারি বাই-ই সেই শবনম। পটনাতে থাকে এখন। নানা জায়গাতে যায় মুজরা নিয়ে। তবে শুধু গায়ই। বাজায় না কোথাও।

তাই?

তাই তো জানি।

রেকাব ভর্তি করে মাঠরী আর বরফি, জিলাইবি আর সামোসা আর গরম ধোঁয়া উঠা বড় এক গ্লাস চা নিয়ে এল পটকান নাসিরের জন্যে। তারপর আনতে গেল সুঘরাইয়ের জন্যে।

পটকান চলে গেলে সুঘরাই বলল, গায়, কিন্তু বাজায় না মানে?

মানে, বাজায় না। তুই একটা বুদ্ধ। এত তওয়ায়েফের গান শুনিস আর এটুকু জানিস না? খুব সামান্য সংখ্যক তওয়ায়েফই এখনও আছে যারা শুধুই গায়, শোয়-টোয় না। শুনেছি শবনম শুধুই গায়। তা ছাড়া ওর বয়সই বা কী?

শোওয়াকেই বাজানো বলে?

জী হাঁ, বুদ্ধরাম।

তারপর বলল, মনে আছে তোর? ও তোর নাম দিয়েছিল ডাকু। জানি না, কী ড্যাকাইতি করেছিল তুই আমার চোখের আড়ালে।

আর তোকে তো ডাকত চুহা বলে। আমার মনে আছে। কেন বলত তুইই জানিস।

সুঘরাই হেসে বলল।

বিন্দাআস

আহা! মনে আছে এক বর্ষার বিকেলে মছিন্দাতে একটি কালো পাথরের উপরে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে শবনম আমাদের সবে শেখা মিয়াঁকি মল্লার গুনিয়েছিল। অতটুকু মেয়ে—কিন্তু কী তার গলা, কী ভাব। সারাজীবন হারমনিয়াম আর সারেঙ্গি ভেঙে ফেললেও কারও কারও গলাতে সুরের পাখিরা বাসা বাঁধে না আর কেউ কেউ জন্মায়ই কোকিল হয়ে। প্রতিটি পর্দাই ভরপুর সুরে বলে। মায়ের পেট থেকে পড়েই। তারপর বলল, মিয়াঁকি মল্লার পুরুষদের গলাতে ভাল খোলে কিন্তু শবনম ছাড়া আর কোনও মেয়ের গলায় আর কোনওদিনও আমরা মিয়াঁ কি মল্লার শুনতে পাব বলে মনে হয় না।

সুঘরাই বলল, আশ্চর্য! জানিস, কাল দরবারি কানাড়া গাইল। কোনও ম্যাংফিলে কোনও গায়িকাকে আগে আমি দরবারি গাইতে গুনিনি। ও কি মিয়াঁদের চিবিয়ে খাওয়ার জন্যেই এসেছিল।

সে তো চোখের দৃষ্টি দিয়েই পারে।

গান গাইবার দরকার কী?

তারপর বলল, জানিস সুঘরাই, তোর মনে আছে কি না জানি না, পরজদাদা বলত, বুঝলি রে! আট তো একটা এফেক্ট, আর সেই এফেক্ট বজায় থাকে^১ পরিবেশনের কায়দায়। আলাপই বল, আর গানই বল, কায়দার শেষ কথা হল কীভাবে আখরি বাহার খুলে দিতে হয়—সেলাম জানিয়ে বিদায় নিতে হয়। জারিনের আওয়াজে যদি গায়কীই চাপা পড়ে যায়, আর গায়ক বা গায়িকা যদি সুর ছেড়ে দিয়ে দু হাতে আশরফির মতো তারিফের টুকরা জমা করতে মন দেয়, তো আমি বুঝব যে মানুষটা বহুতই কম দরের। বাজনা তো শুনেছি মিয়াঁ কি মল্লার অনেক ভাল ভাল বাজিয়ারে কিন্তু আমাদের ছোট্ট শবনম সেই সন্ধেতে তার গলাতে এবং তাও আবার খালি গলাতে, যা গেয়ে গুনিয়েছিল তার তুলনা তো আজ অবধি কারও গলাতেই শুনলাম না।

মনে আছে?

আমরা পরজদাদার প্রতি কৃতজ্ঞভাবে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে চেয়েছিলাম। আমার বা তোর কারও মুখ দিয়েই একটি বাক্য সরেনি।

হঁ। মনে আছে।

শবনম আমাদের অনাবিল, উচ্ছসিত, উদ্বেলিত প্রশস্তির লজ্জাতে মুখ নামিয়ে বসে ছিল। মেঘ-ছেঁড়া আলো এসে পড়েছিল তার সুডৌল সুন্দর মুখে। গঙ্গা মাস্টিয়ের উপর পরতে পরতে মেঘ সাজছিল আর কুন্দফুলের মালার মতো সাদা বকের পাঁতি সেই কালিমার পটভূমিতে দুলতে দুলতে উড়ে যাচ্ছিল। আর তারই সঙ্গে বুরু বুরু করে একটা হাওয়া বইতে লেগেছিল। আমলকী গাছেদের পাহারাতে ঘেরা মছিন্দা নদীর উপরে যে দুটি মাছরাঙা এতক্ষণ উড়ে উড়ে মাছ ধরছিল তাবাও ওড়া থামিয়ে শবনমের গান শুনছিল স্তব্ধ হয়ে, একটি ছোট্ট গাছের ভাঙা পত্রশূন্য ডালে বসে। গানও শেষ হল, তারাও উড়ে চলে গেল দিনান্তবেলাতে।

সুঘরাইয়ের মনে পড়ল, নাসির বলেছিল, সেই সন্ধেতে, তুমি এমন সুন্দর করে কথা বলতে শিখলে কার কাছে পরজদাদা?

সে আছেন আমার গুরু কলকাতার পাঁচুবাণী। হ্যাঁ গানতো শোনে অনেকেই কিন্তু সেই শোনার ঠিকঠাক তারিফ কজন করতে জানে। পাঁচু জ্যাঠা একই সঙ্গে জ্ঞানের আর রসের ভাণ্ডার। তাঁর পায়ের কাছেই বসে শিখেছি যা শেখার।

কত কথাই যে মনে পড়ে সুঘরাইয়ের। তা হলে এই দুলারি বাই-ই সেই শবনম। ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল সুঘরাইয়ের। ভাবতেই তার কী যে ভাল লাগছে। আজকে আর কি সে ডাকাতি করতে দেবে কোনওরকম।

তবে ডাকাতি একটা করেছিল বটে। ছোট্ট ডাকাতি। জোর করে চুমু খেয়েছিল শবনমকে। কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল সুঘরাই। ভাবছিল, মেয়েরা বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। মেয়েদের বড় হয়ে ওঠার রহস্যটি বড় বিস্ময়ের। ফুল ফোটার মতো। গ্রীষ্মশেষের উষ্ম রৌদ্রদগ্ধ ডালে ডালে যেমন করে একরাতেব বর্ষণে সবুজ পর্ণাঙ্কুরে ঢেকে যায় গাছ, এ সেরকম নয়। এই রহস্যর সঙ্গে গাছেদের বেড়ে ওঠার মিল আছে। এক এক বর্ষা ফসল আর তাদের রূপ খোলে। তারা লম্বাতে বাড়ে, আরও চাকচিকা পায়। পুরুষ কি মেয়েদের জীবনে বর্ষা হয়ে আসে?

কে জানে! কতটুকুই বা জানে সুঘরাই।

॥ ৪ ॥

বিকেল বিকেল তৈরি হয়ে নিয়েছিল সুঘরাই। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর লম্বা ঘুম লাগিয়েছিল একটা। সকল নাসির চলে গেলে, ধানখেতিতে গেছিল একবার। গেছঁ বাজরা মকাই ধানের খবর করতে। লোকজন সকলেই আছে তবুও একবার না গেলে চলে না। খেতির লাগোয়াই ভাণ্ডার। তাতেই সব মজুদ হয় তারপর বাজার বুঝে বেচে। এই সুঘরাইয়ের তর রোজগারের উৎস। তার বাপ-ঠাকুরদার রেখে-যাওয়া সম্পত্তি।

এ দিকে নকশালদের দৌরাখ্য রোজই বাড়ছে। ও তো বুর্জোয়াই। তবে ওর কুলি-কামিন কর্মচারী কারও জীবনযাত্রার সঙ্গেই ওর নিজের জীবনযাত্রার বিশেষ তফাত নেই। সকলকেই বিরাদর মনে করে ও। এবং সে খবর নকশালেরাও রাখে। নইলে এত দিনে ও-ও হয়তো খুন হয়ে যেতও।

বাবার একটা ওয়েবলি-স্কট-এর রিভলভার ছিল। পয়েন্ট থ্রি-টু বোরের। সেটাও ঠাকুরদার কাছ থেকেই বাবা পেয়েছিলেন। ও-ও পেয়েছে বাবারই কাছ থেকে। বাবার জীবদ্দশাতেই সেকেন্ড লাইসেন্স করে নিয়েছিল ও, বাবাও যেমন করেছিলেন ঠাকুরদার জীবদ্দশাতে।

তা ছাড়া, বন্দুক রাইফেলও ছিল। টুয়েলভ বোব শটগান, ফোর টোয়েন্টি থ্রি সিংগল ব্যারেল রাইফেল। ঠাকুরদা ও বাবা শিকারও করতেন। ফসল বাঁচাবার জন্যে গুয়ার শম্বর কোটাটা খরগোশ মারতেই হত। গাই বয়েল মেরে দিত বাঘে ও চিতাতে। সে জন্যে প্রয়োজনে তাদেরও মারতে হত।

ও নিজেও একটা কিনেছিল ইন্ডিয়ান অর্ডিনান্স কোম্পানির থ্রি-ফিফটিন রাইফেল। মানুষ মারার জন্যে আইডিয়াল। একটা সময়ে চুরি-ডাকাতি লেগেই থাকত। কোতোয়ালিতে না গিয়ে যার যার ফায়সালা নিজেরাই করত একটা সময়ে। এখন

বিন্দাআস

তো যাদের লাইসেন্সড বন্দুক-রাইফেল আছে তাদেরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। পুলিশ যেমন হয়রানি করে, তেমনই ছিনতাই হবার ভয় থাকে নকশালদের হাতে। থানা থেকেই নকশালেরা কার কার ঘরে কী ওয়েপন আছে তা জেনে নেয়। এ বড় অজীব সময়। শুনেছে, পশ্চিম বঙ্গালেরও এমনই হাল ছিল একটা সময়ে।

এখন বন্দুক রাইফেল সব বেচে দিয়েছে কারণ এখন ড্যাকাইতি করতে যারা আসে তারা এ. কে. ফর্টিসেভেন নিয়ে আসে। স্পোর্টিং বন্দুক-রাইফেল ঐ অস্ত্রের সামনে বেকার। শুধু রিভলভারটাই রেখেছে মনকে প্রবোধ দেবারই জন্যে। প্রয়োজনে তা দিয়ে প্রাণ বাঁচানো যাবে কি না তা অজানা। তবে সস্ত্রের পর বেরোলে ধুতির উপরে বেস্টে গুলি ভরে বেঁধে নিয়ে যায়। তাকে কেউ মারতে এলে দাঁড়িয়ে মারা যাবে না সুঘরাইকে। সে যেই হোক।

নাসিরের কাছে আনলাইসেন্সড প্রহিবিটেড বোর-এর অ্যামেরিকান কোন্স্ট পিস্তল আছে। কলকাতার খিদিরপুর থেকে কেনা। নাসির বলে, ইস জমানেমে ইসব রাখনা বহতই জরুরি হয়। পুলিশ অণ্ডর কানুন কি কুছডি সাহারা নেহি।

এই সব কেনবার টাকা কোথায় পেল নাসির, জানে না সুঘরাই। ওর রুজি বলতে তো ছোট একটা মোপেড মেরামতির কারখানা। তবে নাসির তার ল্যাঙ্গোটিয়া দোস্ত। স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত। ওদের দোস্তিতে কোনও শর্ত নেই। নাসিরের বাবা ছিলেন ট্রেজারির ক্লার্ক। নানা রহস্যময় ব্যাপার স্যাপার ঘটছে আজকাল চারদিকে। গুজুগুজ ফুসফুস। ঠিক কী যে ঘটতে চলেছে আন্দাজ করতে পারে না ও তবে মনের মধ্যে একটা উদ্বেগের মেঘ জমছে সুঘরাইয়ের বেশ কিছুদিন হল।

এই সব বিষয় নিয়ে নাসিরের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে নাসির ফুতকারে উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে বলে, বিন্দাআস। আবৃত্তি করে বলে—

“ভঁমর যে লড়ো তুন্দ লহরৌ সে উলঝো

কঁহা তক চলোগে কিনারে কিনারে?”

মানে, পাড়ে পাড়ে আর কতদিন সাবধানী পা ফেলে ফেলে চলবে? ভয়ের সঙ্গে লড়াইয়ে নামো, চেউয়ের মধ্যে উলটাও পালটাও, তবে না!

জামাকাপড় পরা হয়ে গেছিল সুঘরাইয়ের। নীচ থেকে নাসিরুদ্দিনের মোটর সাইকেলের পিঁ পিঁ শোনা গেল। সুঘরাই নীচে নেমে নাসিরের মোটর সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে পটকানকে বলল, আজ খনা বহার। মগর লওটনেমে দেব হোগি। তুম খা-পিকর শো যানা।

নাসির বলল, ডটকে খানা অণ্ডর মুতকে শো যানা।

পটকান হাসতে গেল কিন্তু সুঘরাইয়ের সামনে হাসতে পারলও না। নাসির এই রকমই। ও যখন সুঘরাইয়ের বাড়িতে আসে, শুধু সুঘরাইয়ের বাড়িই কেন, যেখানেই ও যায়, তখন সে বাড়ির মালিক ওই বনে যায়। দলিল-সনদের কোনও দবকার হয় না। সে বাড়ি নবাবের হাভেলিই হোক কি জমিদারের ভাণ্ডার কি সুঘরাইয়ের মতো কারও বাড়ি। আল্লার বহতই এক দোয়া আছে নাসিরের উপর।

ভাবে পটকান।

বিন্দাআস

মোটর সাইকেলে ওঠার আগে মাফলারটাকে ভাল করে গলায় জড়াল সুঘরাই।
নাসির বলল, শালে বচপনকি পেয়ারি সে মিলনে যা রাহা হ্যায় তেরা কোন্দি
আচ্ছাওয়ালা মাফলার নেহি থা ক্যা?

ইসসেই চলেগা। বকোয়াস মাতো কর।

নীচু গলায় বলল সুঘরাই।

ঈত্তর-উত্তর লাগায়া না ঠিক সে?

নেহি তো।

অপ্রতিভ হয়ে বলল, সুঘরাই।

তু সাচমুচ অজীব আদমি হ্যায়।

বলেই, পাশে দাঁড়ানো পটকানকে বলল, আরে এ সুরত হারাম, দিখতা ক্যা
হ্যায়? যা জলদি। ঈত্তরদান লান।

পটকান ছুঁদাড করে দোতলাতে গিয়ে ইত্তরদান নিয়ে আনলে নাসির হেসে
বল, লেঃ। তু অম্বর লাগালে। ড্যাকাইতি আজভি তো কুছ করোগে, ক্যা? কম
সে কম, থোড়া বহত।

বলে, নিজেই ঘোর লাল রঙা অম্বর আতরের কাউপ্লাসের শিশি থেকে কাচের
ঢাকনি খুলে সুঘরাইকে আতর লাগিয়ে দিল। কানের লতিতে, বুকের চুলে, মাফলারে।
আর নিজে একটু ফিরদৌস লাগাল তার সুচোলো গোঁফে।

বলল, ম্যায় শবনম যেইসী মহকেগা আজ।

সুঘরাই পটকানের সামনে নাসিরকে কিছু বলতে না পেরে চুপ করে থাকল।

নাসির মোটর সাইকেল স্টার্ট করল। বলল, ওটাকে নিয়েছিস তো পেটে বেঁধে?
ফিরতে রাত হয়ে যাবে। যা দিনকাল পড়েছে।

হ্যাঁ। আর তুই?

নিশ্চয়ই।

বলেই বলল, পান তো খাবি?

নিশ্চয়ই।

বলল, সুঘরাই।

নানকু পানওয়ালার দোকানের সামনে তখন রংবাজ ছোকরারা জমায়েত হয়েছে।
সিনেমাতে সঙ্কের শো-এর সময়ও হয়ে এল। 'তুম একেলি, ম্যায় একেলা' ছবি
এসেছে। গড্ডন খাঁ আর বেবি লিটপিটিয়া হিরো-হিরোইন। বহত দামে টিকিট ব্ল্যাক
হচ্ছে। শনিবারের বাজার।

কালিপিলি জর্দা দিয়ে পান নিল দুজনে। চারটে সঙ্কেও নিয়ে নিল।

আজকে রয়্যালস্টাগ-এর পাইট নিয়েছি রে তোর জন্যে।

নাসির বলল।

কামাই খুব জোর হচ্ছে বুঝি?

বেঁকা রাস্তা ধরেছি না। বলিস না কারওকে। আক্সা জানলে তো খাল খুলে
নেবে।

খান্দাটা কী?

চোরাই মোটর সাইকেল আর স্কুটারের রং আর নাম্বার প্লেট পালটে নতুন করে ঝেড়ে দিচ্ছি বাজারে।

ছিঃ ছি। তুই না শায়ের!

শায়ের বলেই তো একটু ভাল থাকা-খাওয়া দরকার। শরাব-টরাব। মির্জা গালিবও দেনাতে ডুবে ছিলেন, সবই মদে উড়িয়ে ছিলেন, সে সব কথা কি মানুষে মনে রেখেছে? মনে রেখেছে তাঁর শেরগুলোকে। নাঃ; জীবনটা বড় ছোট। বুঝলি সুঘরাই। বুড়ো হয়ে জীবন উপভোগ করার মতো বৈধ আমার নেই তোর মতো। তুই গেঁঠ বাজরা বেচ গিয়ে, খেতি-জমি বেচ খেপে খেপে, আমাব পোষাবে না? পাণ্ডেবাবু তো আমারই লাইনের লোক। ক বছরের রহিস সে? দ্যাখ না। আমিও শালা ধান্দা যদি এমনি চলে তো কানাহারি হিল রোডে বাড়ি বানাব বা কিনব আর আমার পেয়ারিকে নিয়ে আসব আমার ঘরে।

পেয়ারি মানে?

মানে, নাজমা।

সে কি? সে তো শাদি-শুদা লেড়কি।

তো কী হল? বাতিল খোড়ি হয়ে গেল সে! তার খোদার খাসির মতো মরদটাকে সরিয়ে দেব দুনিয়া থেকে।

আর বাচ্চাটা?

কত পাখির বাচ্চার গলা মুচড়ে মারলাম আজ অবধি বচপন থেকে, আরও একটা বাচ্চা মারতে কী লাগবে?

নাঃ। তুই

সুঘরাইয়ের বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। বড়ই বদলে গেছে নাসির। ওর সঙ্গে আর বেশিদিন পটবে না সুঘরাই-এর।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। মাঘ মাসের নিস্তেজ লাল রোদে পথের লালমাটি ও ধুলোমাখা গাছপালাকে বিধুর দেখাচ্ছিল। পাখিরা কিচিরমিচির করতে করতে ঘরে ফিরছিল। ঝিঝিঁদের ঝিনিঝিনি শুরু হয়ে গেছিল। বড় চমৎকার শহর ওদের এই হাজারিবাগ। সীতাগড়া, সিলওয়ার আর কানহারি পাহাড় ঘেরা। এখানেই সে জন্মেছে, বড় হয়েছে, একটি সম্ভ্রান্ত বাতাবরণের মধ্যে—গান-বাজনা-সাহিত্য-সহবতের মোড়কে। সেই মোড়কের মধ্যে নাসিরুদ্দিনও ছিল। কিন্তু আজ যা শুনল তাতে বড় ধাক্কা খেল সুঘরাই। নাসিরুদ্দিনের মোটর সাইকেলের পিছনে বসে, তার পিঠের সঙ্গে বুক লাগিয়ে, সেজন্যে হঠাৎই যেন ভারী লজ্জা করতে লাগল ওর। কিন্তু তারই সঙ্গে নাসিরের প্রতি এক ধরনের সম্ভ্রমও জাগল। যখন ভাবল যে, অনেক মানুষই নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু সে যে নষ্ট হয়ে গেছে তা স্বীকার করে না, সেই সত্য সচেতনে লুকিয়ে রাখে। অথচ নাসিরের কোনও লুকোচাপা নেই। ভাবটা এমনই যে, আমি যেমন, আমাকে তেমনভাবেই স্বীকার করে নিলে নাও, নইলে ফেলে দাও, আমার যায় আসে না কিছু।

ছেলেবেলার বন্ধু। ফেলে দেবে কী করে। তা ছাড়া গুণও তো কম নেই

বিন্দাস

নাসিরের। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ তার হৃদয়। এমন হৃদয়বান মানুষ খুব কমই দেখেছে সুঘরাই। বুকের মধ্যে ঝড় উঠল ওর কিন্তু মুখে কিছুই না বলে চুপ করে রইল।

কাছারির কাছে এসে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে নাসির বলল, অভিষেক সিং কি আজও আসবে নাকি?

আমি কি করে বলব। তুইই তো তোর অতিথি করে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে ছদি রায়ের বাড়ি। আমি কি তাঁকে চিনি?

ছদিবাবু সাচমুচ রহিস আদমি। কাতরাস-এ তাঁর কয়লা খাদান ছিল। শখ ছিল শিকার, ক্যামেরা, বন্দুক, রাইফেল আর মাছধরা। ওঁকে প্রথমবার দেখি তোপটাঁচিতে। বারবার সঙ্গে বেড়াতে গেছিলাম স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পরে, এমনই এক শীতের দিনে। দেখি মিহি ধুতি আর খাকি ফুলশার্ট পরে এক ভদ্রলোক জলের পাশে কাপেটি বিছিয়ে বসে আছেন দু দিকে চারপাঁচটা ছইল নিয়ে। পাশে একটা হোয়াইট লেবেল ছইস্কির বোতল, জলের বোতল এবং গ্লাস। ধানবাদ ওয়াটার ওয়ার্কসের দুজন ঠিকিঁদপরা বেয়ারা আর জনা দুই খিদমাদার পেছনে দাঁড়িয়ে। দুপুরবেলা স্কচ খেতে তাঁর কারওকেই দেখিনি আজ অবধি।

নাসির বলল।

তারপরে উনি কাতরাস থেকে হাজারিবাগে এলেন কী করে?

আর কী করে। কলিয়ারিই তো সব চলে গেল। এখানে বাড়ি করেছেন। ইটখোরি পিতিজে ওঁর একটি ছোট ডেরা ছিল শিকারের জন্যে। সেটি আজও আছে। তবে রোজগার চলে গেলে সব কিছু তো আর আগের মতো চলে না। একটা অ্যামরিকান সিলড-ইউনিট গ্রিঞ্জ আছে সেখানে এখনও। চলে না যদিও।

অবস্থা যদি পড়ে গিয়ে থাকে তবে এত মানুষকে খাওয়াবেন কী করে!

সুঘরাই বলল।

আরে অবস্থা পড়লেও দিলেরি আদমির দিল তো একই রকম থাকে। ছদিবাবুর বাড়িতে ম্যাফিল, আর খাওয়া থাকবে না? তা কি হয়?

তা হলে আর রয়্যাল-স্ট্যাগটা আনলি কেন?

মদ খাওয়া বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছেন। যখন খেতেন, নিজেও স্কচ খেতেন, খাওয়াতেনও স্কচ সকলকে। আজ খানও না, খাওয়ানও না। তবে খনা কী রকম কিমতি হবে দেখিস।

তা হলে অভিষেক সিং আসবে কি না তুই জানিস না?

না। তবে বার বার এ কথা তুই জিগগেস করছিস কেন?

করছি এই জন্যে যে বদমাসটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে বুধিয়ার মৃত্যুর পরে। এত বড় শয়তান, আপাদমস্তক ভণ্ড, শুধু পয়সা আর ক্ষমতার জোরে, খবরের কাগজওয়ালাদের মদতে মাথা উঁচু করে সমাজে ঘুরে বেড়াবে আর মানুষে দু দিকে দাঁড়িয়ে কুনিশ করবে এতো আর চোখে দেখা যায় না।

সে তো এখানে দেখছিস। এর পরও তো কিছু আছে না, কী?

কী আছে?

বিন্দাআস

দোজখ আছে আমাদের। তোদের নরক আছে।

সে সব তো অনেক পরের কথা।

জানি না, ছদিবাবু অভিষেককে বলেছেন কি না। তবে নিজে কয়লা খাদানের মালিক ছিলেন। তখন হয়তো অভিষেকের বাবা জ্যাঠা তাঁর খাদানেই কাজ করতেন বা ছোটখাটো ঠিকা নিয়ে দিন গুজরান করতেন। এখন মালিকেরা হল ভিখারি আর লুটেপুটে খাচ্ছে কিছু আমলা আর ঠিকাদার। ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজেশন, কোলিয়ারি ন্যাশনালাইজেশন সবই তো রিকশাওয়ালা আর গরিবদেরই ভালর জন্যে করা!

তো কিসের জন্যে?

ক্ষমতা ক্ষমতা আর ক্ষমতা। পড়িসনি কি? Power corrupts and absolute power corrupts absolutely?

বলেই বলল, এসে গেছি।

অনেক আগে এসে গেলাম মনে হচ্ছে। কোনও গাড়িটাড়িই তো দেখছি না।

আগে না এলে নিরিবিলিতে তোর প্রেমিকার সঙ্গে কথা হবে কী করে? গিফের কাঁহা কি!

তারাই বা আসবে কেন এত আগে?

বাঃ। আসর তৈরি করতে সময় লাগবে না। ফুল সাজানো হবে, আতরদানি, গোলাপজল, মাইক, ঝাড়লঠন, সারেসিঁওয়ালা, তবলিয়া, হারমনিয়মওয়ালা, স্বরমণ্ডল, কত কিসের ইন্তেজাম লাগে। এই ফাঁকে আমরা একটু পুরনো দিনে ফিরে যাব।

বাইকটা লাগিয়ে বারান্দাতে উঠতেই একজন আপ্যায়ন করে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

নাসির ঘাড় ঘুড়িয়ে বলল, সুঘরাইকে, ইনি ছদিবাবুর বড় ছেলে দীপুবাবু।

দুলারি বাই আপনাদের কথা জিগ্গেস করছিলেন। চলুন। উনি পাশের ঘরে বিশ্রাম করছেন।

নাসির যে কখন তলে তলে শবনমকে খবর দিয়ে রেখেছিল তা সেই জানে। শবনম নাকি উঠেছে পুপু ইমামের বাড়ি।

দুলারি বাই, ওরফে শবনম, হালকা নীল রঙের সালোয়ার কামিজ পরে জাজিমের উপরে বসে ছিল। তার চুলে সাদা ফুলের সাজ আর সারা শরীরে হিরের গয়না। একটি বড় নাকছাবি। চোখ দুটি ফিঙের মতো স্পন্দিত হচ্ছে। সিঁথিতে হিরের টায়রা।

সুঘরাইদের দেখে তার মনে এক বিহ্বল ভাব ফুটে উঠল। আমাদের যেন চিনল কিন্তু চিনল না। হাসল কী ব্রীড়া ভঙ্গি করে। নাসিরের তাতে কিছু গেল এল না। ঠোটকাটা সে বলল, আরে শবনম, তুমহারি ডাকু আয়ী ইতনি সাল কি বাদ, তুম ডরতি তো নেহি?

শবনম আরও অনেক সুন্দরী হয়েছে। সে হাসল। কিন্তু সুঘরাই বুঝল এ হাসি ছেলার হাসি। দুলারি বাই দুলারি বাই থাকলেই ছিল ভাল। তার মধ্যে শবনমকে খুঁজতে যাওয়া মুর্থামি। তার মধ্যে সেই মির্জাপুরের দিনের মছিন্দার বিকেলের মেয়েটি আর নেই। সে মরে গেছে। অনেক শহরে মুজরা নিয়ে নিয়ে সে এখন

বিন্দাআস

একজন অভিজ্ঞ পেশাদার নারী হয়ে গেছে। নাই বা বাজাল, গাইয়েও পেশাদার হয়ে গেলে, তার নিভৃত পবিত্রতা হারিয়ে যায়।

কিছু কথা হল সুঘরাই নাসির আর শবনমের মধ্যে। বেশিই ফর্মাল কথাবার্তা, বললও বেশি নাসিরই। সুঘরাই শুনল বেশি, বলল কম।

তারপরই হঠাৎ কুর্নিশ করে শবনম বলল, তানপুরা জারা মিলা লেতি হ্যায়— ইজাজৎ দিজিয়ে।

সুঘরাই বুঝল যে এবার তাদের উঠতে অনুরোধ করছে শবনম। তা করতেই পারে। এত মানুষে গান শুনতে আসবেন সব কিছুই তৈয়ারি তো করতে হবেই। কিন্তু দিলে বেশ চোট পেল সুঘরাই। রাগও হল নাসিরের ওপর। নাসির ও ঘর থেকে ম্যাহফিল যে ঘরে হবে সে ঘরে ঢুকে পকেট থেকে পানের মোড়ক বের করে সুঘরাইকে দিয়ে এবং নিজেও নিয়ে মুচকি হাসি হেসে বলল, বিন্দাআস।

সুঘরাই অবাক হল। অনেক বদলে গেছে নাসির। তার ধান্দা যেমন তাকে বদলেছে তার অভিজ্ঞতাও হয়তো তার মধ্যের সুকুমার ব্যাপারগুলোর ইতি টেনেছে। ও যেন জানতই যে এমনই হবে, এমনই হয়ে থাকে। নাসিরের মনে কোনও আঘাত লেগেছে বলে মনে হল না। কিন্তু সুঘরাইয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। দু-বিনুনি করা শবনমকে সেই মছিন্দাতে কালো পাথরের উপরে যেমনটি দেখেছিল, যেমন করে সেই সন্ধ্যার গানটি তার বুকে এতদিন অবধি জেগেছিল, তেমনটি থাকলেই যেন ভাল হত। বৃকের মধ্যে যখন কোনো প্রিয় গান মরে যায়, তখন প্রিয় পাখি মরে যাওয়ার মতোনই আঘাত লাগে।

দুলারি বাইকে নিয়েই সে সুখী ছিল, শবনম-এ তার প্রয়োজন ছিল না কোনওই।

॥ ৫ ॥

ছদিবাবুর মস্ত বসার ঘর মানুষে ভরে গেছে। তানপুরা ও সারেঙ্গি মেলানোও হয়ে গেছে। সি শার্প-এ গাইবে শবনম। তানপুরা উঁচু ফরাসের পেছন দিকে রাখা। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, নানা বিদেশি পারফ্যুম ও দিশি ইত্বরের গন্ধে ‘ম ম’ করছে পুরো আবহ। তানপুরা ছাড়ছে স্থানীয় দুই নবীন যুবা। সুঘরাই এদের মুখ চেয়ে কিন্তু নাম জানে না। হারমনিয়ামে যিনি আছেন সেই মানুষটিই ভিতরের ঘরে ছিলেন এবং তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে যেন শবনম চলছিল। শবনম তাঁকে ‘আক্বাস সাব’ ‘আক্বাস সাব’ বলে সম্বোধন করছিল। সুঘরাইদের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে তারই মুখের দিকেই তাকাচ্ছিল শবনম বারবার। মানুষটি শব্দ সমর্থ, সুপুরুষ। সিন্ধের সাদা কুর্তা পাজামার উপরে কালো সর্জ-এর জওহর কোট। চারটি কলম গৌজা। দশ আঙুলে দশ আংটি। তার মধ্যে হিরে, পান্না, অ্যামিথিস্ট, রুবি, চুনি, পলা, নীলা সব আছে। তার বুক পকেটে লাল সিন্ধের রুমাল এবং চারটি কলম গৌজা। বাহুল্যের প্রতিমূর্তি যেন মানুষটি। গলায় ফিরং-করে জড়ানো সাদা-কালো খোপ-খোপ মাফলার। মাথাতে কালো ফেজ টুপি। মুখে পান-জর্দ। আর সারেঙ্গিতে যিনি বসেছিলেন তিনি যেন এই জগতের মানুষ নন। সাদা চুল, সাদা, দাড়ি, সাদা সাধারণ কুর্তা পাজামা। তার উপরে ফলসা রঙা ফ্ল্যানেলের একটি জওহর কোট। গলাতে ফলসা-রঙা

মাফলার। দু হাতে একটিও আংটি নেই। দু কানে দুটি সোনার বড় মাকড়ি, পাহাড়ি, আদিবাসী গাঁওবুড়ারা যেমন পরে।

ছদিবাবু সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন গায়িকার এবং সাথ সঙ্গতিয়াদের। ওই বৃদ্ধর নাম উস্তাদ রোশন আলি। সুঘরাইকে রোশন আলি জেব থেকে বেবু করে একটি কার্ড দিলেন। তাতে লেখা, মহম্মদ রোশন আলি, সারেঙ্গি প্লেয়ার, এস এফ এফ।

ছদিবাবু ফিস ফিস করে বললেন, মংলব নেহি সমঝা, না?
নেহি তো।

সুঘরাই বোকার মতো বলল।

ছদিবাবু হেসে বললেন, স্কুল ফাইন্যাল ফেইল।

মানুষটির মুখে এক স্বর্গীয় জ্যোতি আর এক স্বমহিম হাসি অনুক্ষণ মাথা আছে মুখে, আজকালকার দিনে খুব কম মানুষের মুখে ওরকমটি দেখতে পাওয়া যায়। ভারী ভাল লাগল সুঘরাইয়ের।

গলা বের করল দুলারি বাই। দুলারি বাই বলাই ভাল, সে যখন সুঘরাইদের কাছে সেই ছেলেবেলার মিঠাস-এ ঘরের সব খুশবু স্নান হয়ে গেল। সামান্যক্ষণ আলাপ করেই ভীমপলশ্রী উপক্রমণিকা করে ধরে দিল গজলটি। পদ পুরা হতেই সুঘরাই আর নাসির দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। এ তো জাফরের একটি পরিচিত শের।

“ইন হসরগোসে কহদো কেঁহী আওর যা বসেঁ

ইতনী জগহু কঁহা হ্যায় দিলেদাগদার মে।”

মানে হল, এবার কামনা বাসনাদের বলো যে, তারা যেন একে একে আমার হৃদয় ছেড়ে চলে যায়। এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে তাদের বসতে দেওয়ার জায়গা যে আর নেই।

প্রথমে শবনম ধীরে ধীরে গানের ভাঁজটি জাহির করল। তারপরে ধীরে ধীরে লতাপাতা কেটে সুরের আলপনা দিয়ে জরির কাজের Füll দিয়ে যেন রাগের ছকটি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। পরিষ্কার বোঝা গেল যে, গায়িকা অনাকে শোনাবার জন্যে গান শেখেনি, সে শিখেছে গান, নিজেই আনন্দ দেবার জন্য। যে গায়ক বা গায়িকা নিজের আনন্দে গান না গান, তাঁর গান সম্ভবত শেষ অবধি গান হয়ে ওঠে না। প্রত্যেক গায়কেরই হয়তো চোখের মধ্যে একটা সুরের অগ্নিকোণ আছে। সেখানে যদি উত্তাপ দেখা দেয় তা হলেই সুরের ঝড়ুসৃষ্টি যে কিছু হবেই তা আশা করা যায়। তবে নিক্ষেপ বিরিঝিরি বা ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টিও হতে পারে।

“ইন হসরগোসে কহদো”, এই “কহদো” শব্দটিতে যখন পঞ্চম এসে স্থির এবং কোমল মাধুর্যে প্রতিষ্ঠিত হল, আহা! মনে হল যেন সুরে চিরাগ জ্বলে উঠল। এ আলো বর্ষার অন্ধকারে ঝোপ-ঝাড়ের জোনাকির বিকিমিকি নয়, এ যেন বসন্তের পূর্ণিমা। সুঘরাই আর নাসির হতবাক হয়ে তাদের ছেলেবেলার শবনমকে দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। সুঘরাই-এর পরজদাদার জন্যে বড় কষ্ট হতে লাগল। আড়

প্রায় পনেরো বছর আগে পরজদাদা ইলাহাবাদের পথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে চলে গেছেন। আজ থাকলে এই জল-পাওয়া ফুল-ফলন্ত দুলারি বাইকে নিজ চোখে দেখে নিজ কানে শুনে যেতে পারতেন।

একেকটি সুর এসে শ্রোতাদের নিয়ে যাচ্ছিল বর্তমানের গহীনে আর সুঘরাইদের নিয়ে যাচ্ছিল দ্বিস্তলীন অতীতে। শব্দের পর শব্দ নিয়ে খেলতে খেলতে এগিয়ে যাচ্ছিল শবনম যেন মধুকর মধু সংগ্রহ করতে করতে আর ছড়াতে ছড়াতে উড়ে চলেছে হালকা শরীর পলকা হাওয়াতে ভাসিয়ে দিয়ে। ধৈবত আর কোমল নিষাদের ঝটিতি নকশা এঁকে শবনম আবার এসে সমাধিস্থ হল পঞ্চমে। “দিলেদাগদার” শব্দে। সেই পঞ্চমের কী রূপ, কী তার স্মৃতি। ভীমপলশ্রী রাগের যত হিরে জহরত সবই হিরের ঝলকানির মতো জাহির করল সে, উজাড় করে দিল পঞ্চমের সঙ্গে নিজেকেও। তারই পরে কখন পঞ্চম আড়ালে চলে গেল, ছোট ছোট ফিরং, কোমল ঝটকা মেরে আবার এসে দাঁড়াল শবনম দ্বিতীয় চরণে। মধ্যম, গান্ধার এবং রেখাবও হারিয়ে গেল দেখা দিয়েই তাদের গোপন এবং ক্ষণিক রহস্য জানিয়ে, তারও পর সুর এসে দাঁড়াল স্থির হয়ে। আহা কী ঠাহরান্। সুরের পদ্মটি দুলতে লাগল আবার পঞ্চমের আবেগে, যেন কামনা জয়জর সে দুয়া মাঙছে খোদার কাছে, বলছে আরেকবার এসো পঞ্চম, এসে সুধন্য করো, সুধন্য করো।

নাসির বলল, শালা! গান তো নয় তোদের অষ্টমী পূজোর আরতিচক্রই সম্পূর্ণ হল বুঝি!

সুঘরাই চুপ করে রইল। তার বাকরোধ হয়ে গেছিল। ভাল গানবাজনা একা শুনে মজা হয় না। সমঝদার দোস্তু বিরাদরকে পাশে নিয়ে শুনে সেই গানের মহক পুরোপুরি উপভোগ করা যায়।

গজলটি শেষ হল একসময়ে এসে। তারিফের ঝড়ও একসময়ে শান্ত হয়ে এল।

বাইজির গজল শুনেতেই অধিকাংশ মানুষ এসেছিলেন। খেয়াল বা ধ্রুপদ ধামারের সমঝদার ও কারবারি এমনতেই চিরদিনই কম। কিন্তু এক কোণ থেকে কে যেন বলে উঠল বাগেশ্রী শুনব। তাতে চাপা শোরগোল উঠল ম্যাহ্‌ফিলে।

এমনই সময়ে দেখা গেল অভিষেক সিং তিন-চারজন ইহারকে নিয়ে ম্যাহ্‌ফিলে ঢুকল। বড়লোকের প্যায়েরভি করার অভাব কোনওদিনই হয় না। চারধার থেকে কথার ছেঁড়া ছেঁড়া ভেসে এল। অনেকেই তার সঙ্গে দুটি কথা বলে দেখাতে চাইল যে অভিষেক সিংকে তারা চেনে। সবচেয়ে বেশি যা অবাধ করল সুঘরাই আর নাসিরকে তা দুলারি বাইয়ের আচরণ। অভিষেক সিং ঢুকতেই শবনম তাকে বারবার কুর্নিশ করল। ছদিবাবুও অবাধ হলেন কম নয়। অভিষেকের অতীতকালটার সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। তাঁর বাড়িতে, তাঁরই সামনে অভিষেক সিংয়ের এমন খাতিরদারিতে একটু চমকে গেলেন তিনি। পরক্ষণেই বাস্তবকে মেনে নিলেন। তিন তো কাতরাস-এর ছদি রায় নন আর। এখন অভিষেকের মতো কয়লা মাফিয়ারাই হিরো। চানচানি অ্যান্ড ওড়া, অর্জুন আগরওয়ালা, প্রভুদয়াল আগরওয়ালা, রাহার, নন্দলাল জালানরাও আজকে পুরোপুরি বিস্মৃত। দিন বদলায়। টাকা যেখানে যায়,

সম্মান, খাতির প্রতিপত্তি সব সেখানেই গড়িয়ে যায়। সে টাকা যেভাবেই উপার্জিত হোক না কেন। আর এই গড়িয়ে যাওয়াটাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনা প্রতিবাদে দেখতেও হয় এক সময়ের রহিসদের।

নাসির সুঘরাইয়ের বাছ ধরে হঠাৎই, বলল, চল্। হিয়াঁ অওর নহ বৈঠা যায়। কাহে লা?

অবাক হয়ে বলল সুঘরাই।

চল্, ওঠ।

বলে এক ধাক্কা দিয়ে সুঘরাইকে তুলে শবনমের দিকে একবারও না তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। অভিষেক সিংয়ের দিকেও চাইল না একবারও। শুধু ছদ্মবাবুর দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বলল, ইজাজৎ দিজিয়ে ছদ্মবাবু। আভি যানাহি পড়েগা। বহতই জরুরি কাম হয়।

খনা? অওর গানা?

ছদ্মবাবু বললেন।

শেকেগা তো আয়েগা লওটকর। কৌসিস জরুর করেগা।

বলেই, নাসির সুঘরাইকে প্রায় টানতে টানতে সমবেত রসিকবৃন্দের হাত পা মাড়িয়েই প্রায় বাইরে এসে দাঁড়াল। শীতের খোলা আবহে জোরে প্রশ্বাস নিল একটা। তারপরই পথের ধুলোতে থুথু ফেলে বলল, হিয়াঁ আনাই নেহি চাহিয়ে থা। দিখা তুমনে, তুমহারি বচপনকি পেয়ারিকি হরকৎ?

সুঘরাই বলল, তুইই তো নিয়ে এলি।

আমি কি আর জানি। সব আওরতই সমান। ইয়ে ভি আউর ইক সুরাতিয়া নিকলি।

সুরাতিয়া নাসিরের প্রেমিকা ছিল। দেবদাসের পারুর মতো। তার জন্যেই আজও বিয়ে করেনি নাসির। সুঘরাই বিয়ে করেনি অন্য কারণে। ও বড় ভীৰু। ও মেয়েদের চিরদিনই ভয় পেয়ে এসেছে, দাদিমা, মা, ঠাম্মা শেষে শবনম পর্যন্ত সবাইকেই। ও পাখি বোঝে, গাই-বয়েল বোঝে, খেতি-জমি বোঝে কিন্তু মেয়েদের বোঝে না। তাই বিয়ে করেনি। কিন্তু নাসির ছেলেবেলা থেকেই হিরো, মেয়েদের কাছে। সুরাতিয়ার মতো একটা সাধারণ মেয়ে যে তাকে কী করে এমন দাগা দিয়ে গেল তা আজও বোঝে না সুঘরাই। নাসির বলে, কোনও মেয়েই সাধারণ নয়। মেয়েদের সঙ্গে সাপেদের খুব মিল আছে। তবে অমিল একটাই। সাপেদের মধ্যে অনেকেই নির্বিষ কিন্তু আওরৎ মাত্রই বিষধরী।

কী করবি এখন? পটকানকেও তো বাড়িতে বলে এলাম “নো-মিল”।

সুঘরাই বলল।

তাতে কী হল? শবনম তো মিজাজ বিগড়ে দিয়েছিলই তার উপরে ওই শালা অভিষেক সিংকে দেখে মিজাজ আরও বিগড়ে গেল। হায়! হায়! দুনিয়ার কী হাল! আমিও আজকাল বুঢ়া কাম করছি কিন্তু সে একটু ভাল থাকার ভাল খাওয়ার জন্যেই। আমি তো অভিষেকের মতো কামিনা নই।

এখন কী করবি তাই বল?

বিন্দাআস

চল, কানহারির দিকে যাই। সান্নাটা জায়গা। পাহাড়ের উপরের বাংলাতে গিয়ে বারান্দাতে বসে হুইস্টিটা দুজনে শেষ করি, বড় বোতল এনেছি আজ। তারপর পাহাড় থেকে নেমে হান্নানের দোকানে বিরিয়ানি আর চাঁব খেয়ে তোকে নামিয়ে বাড়ি ফিরব। এখন, আমার মাথা গরম হয়ে আছে, গরম বেরুচ্ছে মাথা থেকে। ঠাণ্ডা জায়গাতে চল। সান্নাটা জায়গাতে।

সুঘরাই বলল ঠাণ্ডাতে আমার কানে ব্যথা করছে আর...। তুই দিনকে দিন এক অজীব আদমি বনছিস।

আমি চিরদিনই অজীব। তুইই চিনতে পারিসনি।

নাসির বলল।

নাসিরের মোটর সাইকেলের পেছনে বসে সার্কিট হাউসের সামনে দিয়ে গিয়ে, পুলিশ সাহেবের বাংলা পেরিয়ে কানহারি হিল রোড ধরে কানহারি পাহাড়ের উপরে উঠে যখন ফরেষ্ট বাংলাতে পৌঁছানো গেল, ততক্ষণে সুঘরাই জমে বরফ হয়ে গেছে। আর নাসির বলছে, মাথা থেকে গরম ছুটছে আমার। গরম ছুটছে।

চৌকিদার বলল, বাংলা তো রিজার্ভ আছে। বাংলা খুলে দিতে পারব না।

বারান্দাতে বসি তা হলে। দুটো গ্লাস আর এক জাগ জল এনে দাও।

তাও পারব না হুজুর। সিং সাহাব কখন এসে পড়বেন কী করে জানব? তাঁর রিজার্ভ-করা বাংলার বারান্দাতে আপনাদের বসতে দিয়েছি জানলে সাব বিগড়ে যাবেন। ডি এফ এ সাহেবভি জানলে আমার চাকরিই চলে যাবে।

তা হলে?

নাসির বলল।

কী করব। আমি নাচার।

তা হলে এক কাজ করো। গারাজের মধ্যে আমরা বসছি।

তাও পারব না।

তাও পারবে না? তা হলে বাংলার পেছনে গাছতলাতে বসছি।

গাছতলাতে এখন শিশির পড়বে।

তা হলে?

তা হলে আপনারা আমার কোয়ার্টারের বারান্দাতে বসতে পারেন। তবে মোটর সাইকেলটা এমন করে রাখতে হবে যেন ওঁরা দেখতে না পান।

তাই?

কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল, নাসির।

তারপর বলল, তোমার সিং সাব এখানে খাওয়া দাওয়া করবেন না?

না হুজৌর। আমি কি আর তেমন রাঁধি। ওঁদের খাওয়ায় আসবে হাজারিবাগ ক্লাব থেকে।

কখন আসবেন তোমার সিং সাহাব?

দশটার আগেই আসবেন।

উনি কোথা থেকে আসবেন?

কোথা থেকে নয়, তাঁর তো হাজারিবাগেও বাড়ি আছে, গয়া রোডে।

নাম কি সাহেবের?

অভিষেক সিং সাহাব। বহুত দিলেরি আদমি। পয়সা ভি হ্যায়, দিল ভি হ্যায়।

তা ওঁর নিজের বাড়ি থাকতে এই রাতেরবেলা এই জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের উপর সান্নাটা বাংলোতে কী করতে আসবেন? তাও গরমের দিন হলে কথা ছিল। তা ঠিক জানি না হুজুর। তবে শুনেছি পটনা থেকে কোনও তওয়ায়েফ এসেছে, তাকে নিয়ে আসবেন।

রাত কাটাবেন?

না, রাত তো উনি নিজের বাড়ি ছাড়া কোথাওই কাটান না। মনে হয় ঘণ্টা দুই থাকবেন। এরকম করেন মাঝে মাঝেই।

তা চলে। তোমার কোয়ার্টারেই যাই। এখন বাজল কটা?

সুঘরাই ঘড়ি দেখে বলল, সাতটা।

মোটর সাইকেলটাকে তুলে ঠেলতে ঠেলতে চৌকিদারের কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে নাসির ফিসফিস করে বলল, আজ খুদানে হামলোগোকো হিঁয়া ভেজিন।

আজ কুছ হাঙ্গামা হোগা।

মনে মনে বলল সুঘরাই।

নাসিরের মনের ভাব আর কথা শুনে সুঘরাইয়ের হাত-পা বরফ হয়ে গেল। এমনিতেই তো ঠাণ্ডাতে বরফ হয়েই ছিল।

সুঘরাই বলল, নাসির, ছোড় ইয়ার। চল, হামলোক ভাগেগা হিঁয়াসে। শবনমসে হামলোগোকো কেয়া মতলব?

জাহান্নমমে যানে দো ও রাভিকো। উসসে কুছ মতলব নেহি হামারা, মগর বুখিয়া। পটকানকো বহিন?

সুঘরাইয়ের মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেই প্রায় ভুলে-যাওয়া রাগটা হারিয়ে-যাওয়া প্রিয় কুকুরের মতো হঠাৎই ওর মাথাতে ফিরে এল।

সুঘরাই নিচু গলায় বলল, হাঁ। ম্যায়তো ভুলই গ্যয়ে থে।

॥ ৬ ॥

চৌকিদার তার কোয়ার্টারের ঢাকা-বারান্দাতে একটি চেয়ার এবং একটি টুল পেতে সামনে একটা নড়বড়ে তেপায়া লাগিয়ে দিল। তারপর স্টেনলেস স্টিলের জাগে করে এক জাগ জল আর দুটি স্টেনলেস স্টিলের গ্লাস দিয়ে গেল।

নাসির চৌকিদারকে একটি লাল নোট দিল কুড়ি টাকার।

চৌকিদার সেলাম করে বলল, নেহি ভি দেনেসে ক্যা হোতা থা বাবু।

দেনেসে ভি ক্যা হরজ। আগে দেওয়াই তো ভাল। আমরা যে লোক খারাপ নই তার প্রমাণ তো আগেই দেওয়া উচিত।

নাসির বলল।

বিন্দাআস

পইসে সে ক্যা ভাল-বুঢ়া কি যাঞ্চ হোতা হয়?

তব কওন চিজ সে হোতা হয়?

তুমিই না বললে অভিষেক সিং সাহেব বড় ভাল লোক। পয়সাও আছে, দিলও আছে।

দিল কি দেখা যায়? পয়সাই তো দিল এখন।

নাসির বলল।

ঈ বাত সাহি বোলা আপনে।

তোমার নাম কী?

মুকাদ্দর।

ঘর কোথায়?

বড়কাগাঁও।

ঠিক আছে মুকাদ্দর, তুমি আরামি করো গিয়ে।

আপনাদের বাড়ি কোথায়?

মুকাদ্দর জিগগেস করল।

আমার বাড়ি কোররা আর এই বাবুর বাড়ি সিমারিয়া। হাজারিবাগে বেড়াতে এসেছেন বাবু আমার কাছে।

মিথ্যা কথা বলল নাসির।

মুকাদ্দর শুধোলো।

আপকি শুভ নাম?

মহম্মদ জাকির হুসেন।

সুঘরাই-এর হয়ে নাসিরই বলল।

সুঘরাই লক্ষ করছিল যে পরপর এতগুলো মিথ্যা বলতে নাসিরের একটুও কষ্ট হল না। নাসিরটা দু নম্বরী উঠছে দিনকে দিন। এ কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল সুঘরাইয়ের। ওর বন্ধু নেইই বলতে গেল। বউও নেই। নাসির তাই তার কাছে খুব দামি। নাসিরকেও ত্যাগ করতে হলে থাকবে কাকে নিয়ে?

কাঁধের ঝোলা থেকে বোতলটা বের করে খুলল নাসির। দুটো গ্লাসেই বড় করে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে, মুকাদ্দর চলে গেছে কি না দেখে নিয়ে বলল, আজকাল ইমানদারকেই মানুষে বুদ্ধি বলে। দ্যাখ, তোর পেয়ারের শবনম নিজেকে ভাঙিয়ে কত টাকা রোজগার করছে, তার সঙ্গে কত ইজ্জত খাতিরও। যদিও ওর ইজ্জত বাজারি। পারচেজেবল। আর নিজের ইজ্জত বিক্রি করতে রাজি না থাকায় বুখিয়াকে মরতে হল। পটকানের কাকার মাথাতে যদি একটুও ঘিলু থাকত তবে বুখিয়াকে ভাড়া দিয়ে সে তার মাটির বাড়ি পাকা করে ফেলতে পারত, অনেক খেতি-জমিন কাঁড়া-বয়েল কিনতে পারত অথচ তা না করে মেয়েটাকেই হারাল। বুখিয়া তো কম সুন্দরী ছিল না।

তা ছিল না।

সুঘরাই বলল।

বিন্দাআস

তারপর বলল, শবনমের মতো গান কজন গাইতে পারে?

গান গেয়েই যা রোজগার করে, যা ইজ্জত পায়, তাই তো ওর রাখার জায়গা ছিল না তবু সে নিজেকে এমন করে ছোট করে যে কেন, তাই ভেবে পাই না।

টাকা আর যশ মানুষকে বড়ই ছোট করে দেয়রে সুঘরাই। যার টাকা আছে সে আরও টাকা চায়, যার যশ আছে সে আরও যশ চায়। এই দুই আকাঙ্ক্ষার কোনও শেষ নেই। “বাসস” করতে জানা বড়লোক আর যশস্বী তুই খুব কমই দেখতে পাবি। তা ছাড়া, আমার কী মনে হয় জানিস, এ সবই শবনম করে হতাশা থেকে।

হতাশা? ওর মতো সফল মানুষের কিসের হতাশা?

সাফল্যও মানুষকে হতাশ করে। যদি কেউ সবই পেয়ে যায়, আর চাইবার মতো তেমন কিছুই থাকে না, তখনই মানুষ হতাশাতে ভোগে।

তাই?

বলল, সুঘরাই। কথাটা এমন করে ভাবিনি তো কখনও।

নেং, ভাবাভাবি পরে করিস। এখন খা।

হাজারিবাগ এমনিতেই ঠাণ্ডা জায়গা তার উপরে ওরা চড়েছে কানহারির মাথাতে—

খুদাহর বাড়ির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ঠাণ্ডাটাও এ বছর জন্মের পড়েছে।

সুঘরাই বড় একটা ঢোক গিলল গ্লাস থেকে। যা কড়া বানিয়েছে নাসির। লণ্ঠনের আলোতে দেখাচ্ছে যেন কাড়ুর তেল। ওর পেটের মধ্যে ব্যথা করছে। টেনশনে। কী করবে নাসির, কে জানে। কী যদি সে ফেঁদেছে সেই জানে। ও কি আজ জানেই মেরে দেবে অভিষেক সিংকে? নাকি একটু টাইট দিয়েই ছেড়ে দেবে? অভিষেক সিংয়ের সঙ্গে নাকি সবসময় বডিগার্ড থাকে। সেই বডিগার্ড যদি মেরে দেয় ওদের ওরা কিছু করার আগেই? নির্বিরোধী, শান্তিপ্ৰিয় সুঘরাই বড় ঝামেলাতেই পড়ল।

নাসির এক ঘুট খেয়ে বলল, কী ভাবছিস?

না। তুই কী ভাবছিস, তাই ভাবছি।

আগে থেকে আমি কিছুই ভাবি না। যেমন যেমন সময় এগোবে তেমন তেমন ভাবব। তার আগে বাইকটার সামনে-পেছনের নাস্বার প্লেটে এই কালো মার্কারটা ঘষে নাস্বার যাতে পড়া না যায় তেমন করে দিয়ে আয় তো। দেখিস, চৌকিদার যেন না দেখে ফেলে।

বাবাঃ। তুই তো দেখছি আজকাল পাক্সা দু-নস্বরী হয়ে গেছিস।

আমি কোথায় হলাম। দুনিয়াই যে দু-নস্বরী হয়ে গেল তাই আমাকেও জার্সি পালটাতে হল।

কটায় আসবে বলল ওরা এখানে? চৌকিদার?

সাড়ে নটা মতো তো বলল।

আগেও তো আসতে পারে।

বিন্দাআস

তা তো পারেই। কাম একবার চেগে গেলে আর কি তর সময়?
এখন কটা বাজে?

সাড়ে সাত।

আমরা এখন থেকে সাড়ে আটটায় উঠব। না, তারও আগে উঠব।

মানে? কোথায় যাব?

পাহাড় থেকে নেমে জিব্রান্টার বাড়ির কাছে পথের পাশে ওদের অপেক্ষায় থাকব। জায়গাটা অন্ধকার। শীতের রাতে জনপ্রাণী থাকবে না। চৌকিদারও ঘটনার পরে কোনও সন্দেহ করতে পারবে না। কারণ, ও কিছু বুঝতেই পারবে না এত দূর থেকে। গুলিটুলি চললে অবশ্য গুলির শব্দ শুনতে পাবে। কোরবার দিক থেকেও তো কেউ আসতে পারত। পুলিশও ধন্দে পড়বে।

কী, কী, কী করবি কী তুই?

ভয় পেয়ে সুঘরাই বলল। গুলিটুলি চললে মানেটা কী?

দেখি কী করি। ওয়াস্তপর শোচেগা। তোকে যা বলব তুই তাই করবি। ওদেব গাড়ি আসতে দেখলেই তোর মাফলারটা দিয়ে মাথা মুখ এমন করে বাঁধবি যাতে রাজডেরোয়া ন্যাশানাল পার্কের হনুমানে আর তোতে তফাত না থাকে কোনও।

আর তুই?

আমার মুখোশ আছে।

মু-মু-মুখোশ? তুই আজকাল মুখোশ নিয়ে ঘুরছিস নাকি?

হ্যাঁরে ছুঁওড়াপুস্তান। একটা কেন? আজকাল সব ইনসানেরই একাধিক মুখোশ থাকে। যখন যেটার দরকার সেটা পরে নেয়। তারা সব ছুপা। আমার কতো মুখোশের কথা কেউই কবুল করে না।

সুঘরাই চুপ করে রইল। তারপর নাসির যা করতে বলেছিল তাই করে এল।

নাসির ওর থ্রাসটা শেষ করে আরেকটা বড় ঢালল। সুঘরাই ঘাবড় গিয়ে বলল, করছিস কী? তুই তো আউট হয়ে যাবি। এ দিকে সাংঘাতিক কাণ্ডমাণ্ড ঘটতে চলেছিস।

হাঃ। আমি সবসময়েই ইন। আউট কখনওই হই না আমি। আই অ্যাম ওলয়েজ অ্যামংগস্ট ইন থিংগস। বলেই বলল,

“ও অণ্ডর হোঙ্গে যো পীতে হ্যায় বেখুদিকে লিয়ে।

মুখে স্রিফ চাহিয়ে থোরিসি জিন্দেগিকে লিয়ে।”

অর্থাৎ, ওরা মদ খায় জীবনকে ভুলে থাকতে আর আমার সামান্যই চাই, জীবনকে মনে রাখারই জন্যে।

সুঘরাই ভিতরে ভিতরে খুব উত্তেজিত বোধ করতে লাগল বলেই বাইরে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেল।

সুঘরাই বলল, তুই মিছিমিছি অপমান করলি নিজেকেও এবং আমাকেও।

কী জন্যে? কার কাছে?

শবনমের সঙ্গেগা আলাদা করে দেখা করতে চেয়ে ছদিবাবুর বাড়িতে। সে তো

বিন্দাআস

আমাদের যেন মনেই করতে পারল না অথচ পরজন্মাদা কত কীই না করেছে ওর জন্যে।

ছাড়তো। রান্ডি তো রান্ডিই। ও শালীরা মান দিলেই কী আর অপমান দিলেই কী? আমাদের অপমান করল আর মান দেবে অভিষেক সিংকে। নইলে কি রান্ডি এমনি বলে।

আমার ভাবতেও খারাপ লাগছে। যে মেয়ে এত সুন্দর গান গায়, যার গান শুনলে প্রাণ দিতেও আপত্তি থাকে না আর সেই কি না

ছাড়। আওরাত জাতটাই অমন। কলকাতায় বা বম্বেতে বা চেন্নাইতে কত নামীদামি অভিনেত্রী, পরিচালিকা আছে। সারা পৃথিবী থেকে সম্মান আনছে তারা। তাদের রূপ-গুণের অবধি নেই, বহত বহত পড়ে-লিখেও তারা। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই রান্ডি। সতী সেজে থাকে শালীরা।

কথাটা শুনে সুঘরাই আহত হল।

পাহাড়ের নীচ থেকে একটা কোটরা হরিণ ডাকতে লাগল ঘনঘন।

কী রে। বাঘ দেখল নাকি?

সুঘরাই বলল।

দেখল তো দেখল। আসল বাঘ তো দেখিনি। আমি নামি নীচে তখন আসল বাঘ দেখবে।

বাজল কটা?

নাসির বলল।

সুঘরাইয়ের ঘড়িতে রেডিয়াম আছে, তা ছাড়া ইন্ডিগ্লোও আছে। নাসিরই দিয়েছিল ঘড়িটা সুঘরাইকে গত বছরের সালগিরাতে। চাবি টিপে ও বলল, আটটা দশ।

তা হলে চল এবারে আমরা আস্তে আস্তে নামি। এক কাজ কর। আরেকটা করে খেয়ে নে। তারপর বোতলের মধ্যে জল মিশিয়ে নিয়ে যাব। বোতল থেকেই খাব। ওখানে আর জল কোথায় পাব? গ্লাসই বা কোথায়?

যেমন বলবি।

নাসির আবার সেজে দিল। চুমুক দিতেই লিভারে যেন কামড় দিল হুইস্কিটা। দোষটা হুইস্কির নয়, নাসির সেজেছেই ভীষণ কড়া করে।

সুঘরাই মুখ বিকৃত করল।

তারপর বলল, কী রে! মওত-এর স্বাদ কি তোর সেজে দেওয়া হুইস্কিরই মতন?

তুই যেন শালা কত বার মরেছিস আগে।

মরিনি। কিন্তু মৃত্যু কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে বহুবীর। মনে আছে তোর? নাজিম মিয়র কুসুমভার মাটির ঘরী তোর রাইফেলের গুলি লোড করার সময়ে আমার কানের পাশ ঘেঁষে গিয়ে দেওয়ালে গর্ত করে দিয়েছিল?

মনে আছে। ম্যান-ইটিং লেপার্ডটাকে মারতে গেছিলাম আমরা যেবারে, সে বারে তো?

জি হ্যাঁ।

বিন্দাআস

তারওপর আরও কত বার।

আমি তো নাগরদোলাতেই পড়ে আছি রে সুঘরাই পনেরো বছর বয়স থেকে।
জীবন আর মৃত্যুর হাতে দোল খেয়েছি। দোল খাচ্ছি। আই ওলওয়েজ হ্যাড লিভড
ডেঞ্জারাসলি। প্যানপ্যান করে বেঁচে কী লাভ? বাঁচলে এমন করে বাঁচাই ভাল।
বলেই বলল, নে, শেষ কর।

বলেই, জাগ থেকে বোতলের মধ্যে জল ঢেলে বোতলটা ভর্তি করে নিল নাসির।
তারপর নিজের থলেতে ভরে নিল। বলল, চৌকিদার মুকাদ্দরকে ডাক তো একবার।
চৌকিদার এলে আরও একটা লাল নোট দিল কুড়ি টাকার।
চৌকিদার হেসে সেলাম করল।

নাসির বলল, আমরা তো তোমার সিং সাহেবের মতো বড়লোক নই, হলে
একশ টাকার নোট দিতাম।

সিং সাব আমাকে পাঁচশ টাকার নোট দেন একটা, যখনই আসেন।

নাসির বলল, খ্যয়ের, আমিও দেব পরের জন্মে। এবারে আমরা উঠি। বাড়িতে
শুভ্রাল থেকে মেহমানেরা সব আসবেন। বেশি দেরি হলে গোলমাল হবে। আমার
বিবির আবার এ সব একেবারে না-পসন্দ।

কী সব?

এই পিনা-উনা।

চৌকিদার মুকাদ্দর হেসে বলল, আমার বিবিরও। তবে আমি খাই মছিয়া। এ
সব ভাল জিনিস কোথায় পাব? তবে হ্যাঁ! মিথ্যে বলব না, সিং সাহেব বোতলে
যা থাকে তা আমাকে দিয়ে যান। কী সব শিশি ছজৌর। সেই সব শিশি পেয়ে
বিবি আমার, আমার মদ খাওয়ার অপরাধই ক্ষমা করে দেয়। আসলে সব সাপকেই
বশ মানানো যায়, যদি মস্ত্র জানা থাকে।

সাহী বাত্।

বলে, নাসির উঠল।

তারপর বলে, অব চলে মুকাদ্দর সাব। বহত মেহেরবানি আপকি।

সাব সম্বোধনে মুকাদ্দর অভিভূত হয়ে বলল, আপকি খানদান জরুর বহত উঁচা
হোগি। অ্যাসি এতলাখ অওর তমদ্দুন।

নাসির উত্তর দিল না কোনও। সুঘরাই নাসিরের পেছন পেছন চলল মোটর
সাইকেলের দিকে, হাত তুলে মুকাদ্দরকে সেলাম এবং নমস্কারের মাঝামাঝি একটা
কিছু করে। এই ব্যাপারটা ঘটল নাসিরেরই অনুপ্রেরণাতে।

মোটর সাইকেল স্টার্ট করে পাহাড়চূড়ো থেকে নামতে নামতে নাসির বলল,
যার যা স্ট্যাটাস তাকে তার চেয়েও এক ধাপ বেশি সম্মান দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে
বান্দা বনে যাবে। হ্যাঁ, যদি ইনসান হয়। আর অভিষেক সিংয়ের মতো কামিনা
হলে আবার উলটো ফলও ফলতে পারে।

বলেই বলল, আজ সকাল কার মুখ দেখে উঠেছিলিরে সুঘরাই?

কেন?

বিন্দাআস

না, কানহারিতে হুইস্কি খেতে এসে আমাদের নিয়তির মুখোমুখি এসে পড়লাম কী করে তাই ভাবছি।

সুঘরাই একটু ভেবে বলল, একটা কাঠবিড়ালির। ও আমার দোতলার ঘরের লাগোয়া ছাদেই থাকে।

হাঃ হাঃ করে হাসল নাসির।

বলল, যেমন তুই এক ক্যারেকটার তেমনই তোর সাথ-সঙ্গতিয়ারা।

পাহাড় থেকে নেমে এসে কানহারি হিল রোডে জাস্টিস মল্লিকদের প্রাগৈতিহাসিক প্রাসাদের মতো ভৌতিক বাড়ি 'জিব্রান্টর'-এর পাশে মোটর সাইকেল দাঁড় করাল নাসির। তারপর বলল, নে, খা। বোতলটা শেষ করতে হবে। প্রাণে যদি না বাঁচি তবে তো আর হুইস্কি খাওয়া হবে না কোনওদিনও।

সুঘরাই বলল, বাজে কথা রাখ।

বাজে কথা কী রে! একজন মানুষের প্রাণের উন্মেষ আর তার মৃত্যুর মতো এত সহজ ব্যাপার আর দুটি নেই। বলতে গেলে, সহজতম ব্যাপার। আর এই মানুষেরই কত না গুমোর তার জীবন-মরণ নিয়ে। ফুসস-স-স।

বোতল থেকে এক ঢোক খেয়ে বোতলটা নাসিরকে ফেরত দিয়ে সুঘরাই বলল, আমি আর খাব না।

কেন?

আমি পারি না।

তুই শালা কিছুই পারিস না।

হবে।

স্বগতোক্তির মতো বলল, সুঘরাই।

শীতের বনের রাতের এক বিশেষ গন্ধ আছে। শিশির-ভেজা হরজাই গাছপালার, পথের ধুলোর, বিস্তীর্ণ টাঁড়ের, টিটি পাখির, পঁচঁচর গায়ের গন্ধ মিলে-মিশে এক আশ্চর্য তিস্ত-মিষ্টি-কষায় গন্ধ। এই গন্ধে এক ধরনের যৌনতা আছে—যা ব্যাখ্যা কবে বলতে পারবে না সুঘরাই। কিন্তু বিলক্ষণ আছে। ডানদিকের টাঁড়ের উপরে চমকে চমকে ডাকছে দুটি ডিড-ড্য-ডু-ইট পাখি। ডিড-ড্য-ডু-ইট? ডিড-ড্য-ডু-ইট? ডিড-ড্য-ডু-ইট? সেই ডাক ভেসে যাচ্ছে দূর থেকে দূরান্তরে, উঠে যাচ্ছে তারাদের দিকে। গাছপালা থেকে শিশির ঝরছে। বছরের এই সময়ে রাতেরবেলা বাঘ ও চিতা বনের মধ্যে প্রধান পথ ধরে চলাচল করে শিশিরের হাত থেকে বাঁচতে। নাসিরও দেখে শুনে এমন জায়গাতে মোটর সাইকেলটা লাগিয়ে ছিল যেখানে উপর থেকে শিশির ঝরছে না। নাসিরও তো বাঘই। দেখতে দেখতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। সুঘরাই একবার ঘড়ি দেখল। এমন সময়ে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। এ পথে ও সময়ে এখন কোনও গাড়িরই যাওয়া-আসার কথা নয়। ওদের ছেলেবেলাতে ওরা রাতেরবেলা এখানে খরগোশ মারতে আসত। জিব্রান্টরের অব্যবহৃত কম্পাউন্ডে অগুনতি খরগোশ ছিল।

ভাল করে কানখাড়া করে শুনতেই বোঝা গেল গাড়ির শব্দটা কোরবার দিক

থেকে আসছে। গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা যেতেই দুজনেই বাইক থেকে নেমে এমন ভাবভঙ্গি করল যেন বাইকটা খারাপ হয়ে গেছে। গাড়িটা একটা অ্যাম্বাসাডর। অভিষেক সিং কোন গাড়ি নিয়ে আসবে তা জানা নেই। কোন গাড়ি নিয়ে সে গান শুনতে গেছিল সেটা খেয়াল করা উচিত ছিল। তখন তো আর জানত না যে, ওরা কানহারিতে এসে ওর সঙ্গে টক্কর দেবে। যে গাড়িটা এল, সেটা পাহাড়ে না চড়ে হাজারিবাগ শহরের দিকে এগোল। ওদের পাশে এসে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়েই এই খারাপ দিনকাল-এ রাতেরবেলা ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না মনে করেই বোধ হয় হঠাৎ গতি বাড়িয়ে চলে গেল। গাড়িটার এঞ্জিনটার বারোটা বেজে গেছে। পেট্রোলের গন্ধে বনপথের সুগন্ধ বিকৃত হয়ে গেল।

ওই গাড়িটা চলে যাবার পরেই হাজারিবাগ শহরের দিক থেকে একটি গাড়িকে আসতে দেখা গেল। উজ্জ্বল দুটি নিচু হেডলাইটের আলোই বলে দিল যে অ্যাম্বাসাডর নয়, নতুন কোনও গাড়ি। আলো দেখতে পেতেই কালো কাপড়ের মুখোশটাকে কপালে লাগিয়ে নাসির বাইকটাকে ঠেলে পথের মধ্যখানে এনে তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। সুঘরাই পাশে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িটা ব্রেক করে দাঁড়াল। হেডলাইট-জ্বলা অবস্থাতেই সামনের বাঁদিকের দরজা খুলে গেল। একজন বেঁটেখাটো লোক নেমে এসে বলল, হ্যাঁ ক্যা?

খরাব হো গ্যায়া।

নাসির বলল।

খরাব হো গ্যায়া তো সাইড করকে রাখনা চাহিয়ে থা। ঈ ক্যা মজাক হো রহা হায়?

নাসির বলল, বড়া তেজ বাঠেঁ কর রহা হায় আপনে। ঈ গাড়ি হায় কিসকো?

অভিষেক সিং সাবকো।

আচ্ছা! অভিষেক সিং পহচানতা হায় মুঝকো, জারা সালাম দেনা উনকো। মেহেরবানি করকে।

আপকি শুভনাম?

ম্যায় ঈ অভিষেক সিং কি মওত।

ইতিমধ্যে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে গেল। শবনমের সুরেলা গলা শোনা গেল, মং উতারিয়ে, আপ উতারিয়ে মং। কিন্তু প্রায় ছ ফিট লম্বা অভিষেক সিং গাড়ির দরজা খুলে নেমে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, রে ভিখু, ঈ কওন বদতমিজ আদমি হায়? মুঝকো জানতে নেহি হায় যে রোডকি বিচমে বাইক উঠাকে মজাক কর রহা হায়।

অভিষেক এগিয়ে আসতেই নাসির গুটোনো মুখোশটা নামিয়ে কোমরের হোলস্টার থেকে নাইন পয়েন্ট ফাইভ কোন্ট পিস্তল বের করে দমাদম তিনটে গুলি করল। আর সঙ্গে সঙ্গে, মাস্টারে! বলে অভিষেক পথের উপরেই পড়ে গেল, চারদিকের পথের ধুলোতে তার ঘামন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিখু নামের বেঁটে লোকটি তার কোমর থেকে রিভলভার খুলে নিয়ে পরপর দুবার গুলি করল

বিন্দাআস

নাসিরকে। নাসির এবং ভিখু দুজনেই পয়েন্ট ব্র্যাক্স রেঞ্জ থেকে গুলি করেছিল। নাসির পড়ে যেতে যেতে বলল, বিন্দাআস.....।

সুঘরাইয়ের ঈশ হয়েছে ততক্ষণে, সেও তার রিভলভার বের করে ভিখুকে গুলি করল তার মাথাতে। ভিখু কিছু বোঝার আগেই। ভিখু সুঘরাইকে ট্যাডুস ঠাউরেছিল। এক পটকান দিয়ে ভিখু পথের উপরে পড়ে গেল চিংপটাং হয়ে।

তার রিভলভার হাতেই ধরা রইল।

ইতিমধ্যে অভিব্যেক সিংয়ের ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ি ব্যাক করে শহরে ফিরতে যেতেই সুঘরাই ড্রাইভিং সিট লক্ষ করে গুলি চালান। কাচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল আর ভিতর থেকে শবনম আর্ত চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও! বাঁচাও! ডাকু হায়া। বাঁচাও! বলে।

সুঘরাই রিভলভার হাতে গাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে সামনের বাঁ দিকের দরজা খুলে মুখ ভিতরে করে বলল, চূপ হো যা রাভি! আঁখ খোলকর দিখ তেরা ডাকু আয়া। মির্জাপুর কি ডাকু। তেরি বচপন কি ডাকু। বলেই, পরপর দুটি গুলি করল শবনমের সুন্দর দুটি বুক লক্ষ করে।

ড্রাইভারের ঈশ ছিল না। তবুও সাবধানতার মার নেই ভেবে তার মাথাতে নল ঠেকিয়ে আরেকটি গুলি করল সুঘরাই। বাকি ছিল একটি গুলি। সেটিও অভিব্যেক সিংয়ের কানে নল ঠেকিয়ে তাকে শেষ নৈবেদ্য দিল।

তারপর?

তারপর কী করবে তা আর ভেবে পেল না সুঘরাই। বোতলে যেটুকু ছইস্কি ছিল ঢকঢকিয়ে খেয়ে গাড়ি থেকে ড্রাইভার আর শবনমের দেহ নামিয়ে পথের উপরে ফেলে নাসিরকে অভিব্যেকের গাড়িতে তুলে সে তাদের ছেলেবেলার বন্ধু ডাক্তার গিরধারী তিওয়ারির বাড়ির দিকে চলল যত জোরে পারে গাড়ি ছুটিয়ে। সুঘরাই ভাবছিল, নাসির যদি মরে গিয়ে থাকে তো বেঁচে গেছে।

সুঘরাইও হয়তো অন্যরকম বাঁচা বেঁচে যেতে পারত যদি সে মোটর সাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু ভাবল, যদি নাসিরের দেহে প্রাণ থেকে থাকে? দেখা তো যাক। ফেলে-যাওয়া মোটর সাইকেলটিই তার ইস্তেকাল ঘটাবে। যাবজ্জীবন জেলে পচতে হবে সুঘরাইকে। কিন্তু রামজির দিবি, সেই মুহূর্তে তার একটুও ভয় করছিল না। কিছু তো করল তবু জীবনে। তার ম্যাদামারা জীবনে একটা কাজের মতো কাজ করল।

বুধিয়ার মুখটি মনে পড়ছিল, বুধিয়ার মা ও বাবার মুখ এবং পটকানের মুখও। ভারী এক তৃপ্তি লাগছিল সুঘরাইয়ের। আশ্চর্য। বুধিয়ার মুখটি মনে পড়ছিল কিন্তু শবনমের মুখটি আর মনে পড়ল না। তার এক সময়ের বড় আদরের সেই মুখটি মুছে গেছে চিরদিনের মতো।

গাড়ি চালাতে চালাতে সুঘরাই ভাবছিল, নাসির যদি এখন কথা বলতে পারত, তা হলে চৈচিয়ে বলত, বিন্দাআস.....।

সুঘরাই নিজের অজানিতেই বিড়বিড় করে স্বপ্নতোস্তি করল, বিন্দাআস।

